পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

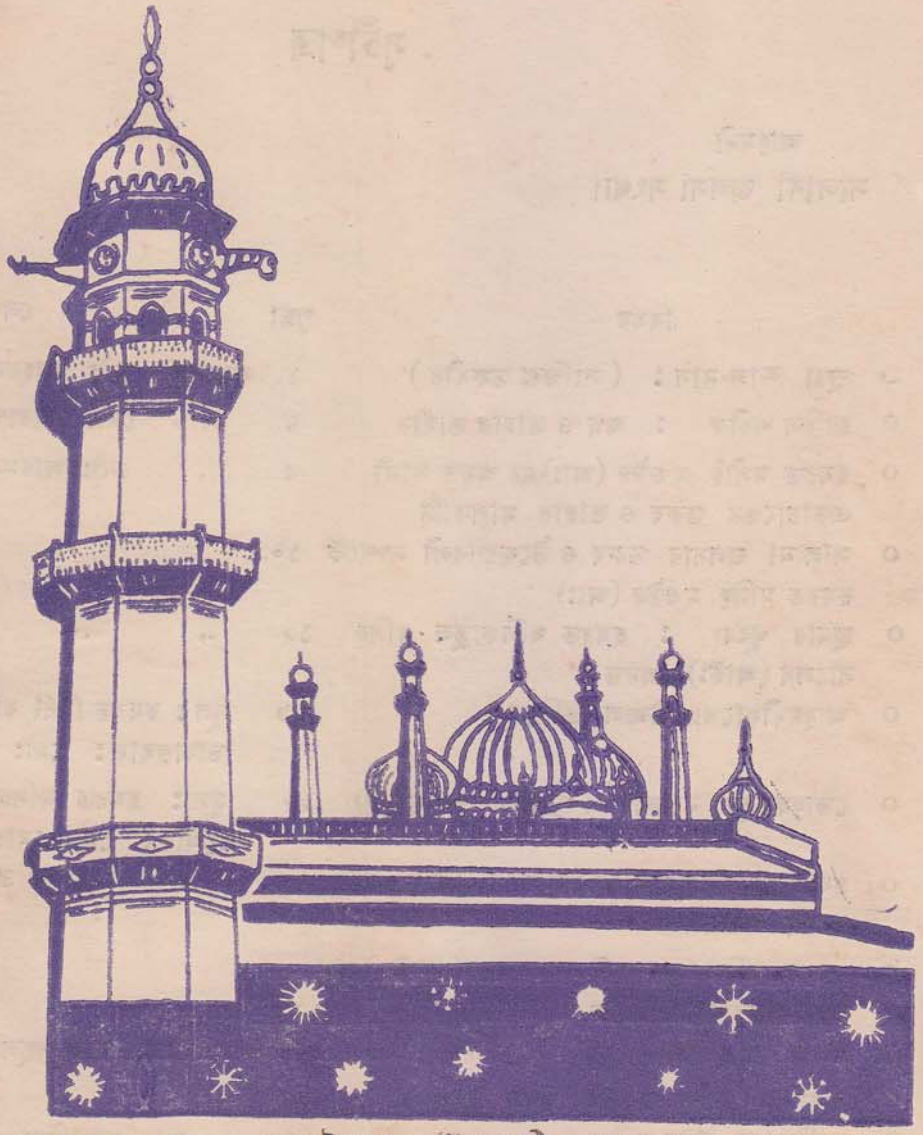

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২১ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র, ১৩৮০ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৪ ইং : ৬ই রবিউল আওয়াল, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
সালানা জলসা সংখ্যা

২৭শ বর্ষ
২১ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল-নাস : (সংক্ষিপ্ত তফসীর)	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ হাদিস শরীফ : স্বপ্ন ও তাহার তাবীর	৪	,, মৌঃ মোহাম্মাদ
০ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর অমৃত বানী এতায়াতের গুরুত্ব ও তাহার মাপকাঠি	৫	,, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ সালানা জলসার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)	১০	,, ,, ,,
০ জুমার খুৎবা : হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত	১২	,, ,, ,, ,,
০ আহ্‌মদীয়াতের উজ্জল ভবিষ্যৎ	১৬	মূল : হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) ভাবানুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান
০ তোহ্‌ফাতুন নদওয়া (পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ)	২২	মূল : হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ
০ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর জরুরী পয়গাম	২৫	,, মাহ্‌বুবুর রহমান
০ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর নূতন গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক	২৬	
০ শান্তি (কবিতা)	২৭	চৌধুরী আবদুল মতিন
০ সংবাদ : মসিহ্ মওউদ দিবস উদযাপন	২৮	
০ আসিয়াছে আল-মসীহ্	২৯	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
০ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠা)	৩৪	
বয়েতের দশ শর্ত	(কভার পেজ)	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা :
১৭ই চৈত্র, ১৩৮০বাং : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৪ইং : ৩১শে আমান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল-নাস

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

সুরা ফালাকের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনকালের অকল্যাণসমূহ হইতে আল্লাহর আশ্রয় লাভের দোয়া শিখান হইয়াছিল, আলোচ্য সুরায় রব, মলেক এবং এলাহ্—সেফত সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা ক্রমিক ধারায় জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং من شر ما خلق-এর মোকাবেলায় رب الناس আসিয়াছে; من شر غاسق اذا وقب-এর মোকাবেলায় ملك الناس এবং ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد-এর মোকাবেলায় اله الناس আসিয়াছে।

জন্মের সম্পর্ক রুবুবিয়তের সহিত রহিয়াছে

এবং মাতৃ গর্ভ হইতে জন্মের পরেও সৃজন সর্বক্ষণ জারী থাকে, এমনকি ডাক্তারদের অভিমত এই যে, সাত বৎসর অন্তর মানব দেহ পরিবর্ত্তিত হয়। এইজন্য খোদাতায়ালার রুবুবিয়তের সম্পর্কও সব সময় সচল রহিয়াছে। এজন্য বলা হইয়াছে যে, قل اعوذ برب الناس—'আমি সেই রবের আশ্রয় ভিক্ষা করি, যাঁহার রুবুবিয়ত মানুষের জন্য সার্বক্ষণিক গতিতে অব্যহত; মানব দেহে সর্বক্ষণ সংঘটিত ভাল-মন্দ পরিবর্তন সমূহ যেন আমাকে অকল্যাণের দিকে না লইয়া যায়।'

তেমনিভাবে মৃত্যুও সর্বক্ষণ চলিতেছে—মল, মূত্র, নখ, চুল ইত্যাদি দেহের মৃত অংশ বিশেষ। এই প্রকার মৃত্যু সর্বক্ষণ মানুষের মধ্যে চলিতেছে। এজন্য ملك الناس (মলেকেন নাস)-এর আশ্রয় লাভের জন্য বলা হইয়াছে যে, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান বা বিচারের যে সেফত ক্রিয়াশীল আছে, উহার অধীনে আমি যেন বিফলতা ও অকৃতকার্যতার কবলে না পড়ি বরং আমার উপর তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহই যেন হইতে থাকে।

তৃতীয় অবস্থা এই যে মনে স্বার্থপরতা আসিয়া যায় এবং নিয়ত খাঁটী ও পবিত্র থাকে না। এজন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বল الـه الناس—যিনি সকলের মাবুদ, তাঁহার নিকট ইহা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি, যে আমার নিজের মধ্যেও যেন বিকার সৃষ্টি না হয় এবং তিনিও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন।

من شر الوسواس الخناس ০ الذى يوسوس فى صدور الناس ০ من الجنة و الناس ০

وسواس (ওয়াস ওয়াস)-এর অর্থ কল্যাণহীন কথা, শয়তান এবং নিম্নস্বর হইয়া থাকে। خناس (খান্নাস)-এর অর্থ হইয়া থাকে অন্যের প্রভাব গ্রহণকারী, সেই ব্যক্তি যে মানুষ হইতে দূরে সরিয়া থাকে, পশ্চাদপসরণকারী, কথা সংগোপনকারী; নিজ সাথীদের মধ্যে আত্মগোপনকারী। তেমনিভাবে جن (জিন্)-এর অর্থও আত্মগোপনকারী। এই শব্দটি انس (ইনস্)-এর মোকাবেলায় আসে এবং جن (জিন) বড় লোক বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বলা হয়, যাহারা জনসাধারণ হইতে পৃথক থাকে।

من الجنة والناس (মিনাল জিন্নাতে ওয়ান-নাস)—আয়াত يوسوس فى صدور الناس (ইউওয়াসয়েসো ফি সুদুরেন নাস)-এর সহিতও সম্বন্ধ রাখে এবং সেই ক্ষেত্রে উহার অর্থ হইবে যে, কুমন্ত্রণাদাতা মানুষের অন্তরে ওসওসার সৃষ্টি করে এবং ছোট-বড় প্রত্যেকের মনে কুমন্ত্রণাদান করে। তেমনিভাবে উক্ত আয়াতের সম্বন্ধ من شر الوسواس الخناس (মিন শার্রেল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস)-এর সহিতও হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, আমি ওসওসা সৃষ্টিকারীর অকল্যাণ হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করি, যে ওসওসা সৃষ্টি করিয়া নিজে পিছনে সরিয়া পড়ে বা আত্মগোপন করে এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ছোট বা সাধারণ লোকের মধ্য হইতেও হয় এবং বড় (বা বিশিষ্ট) লোকদের মধ্য হইতেও হইয়া থাকে, তেমনিভাবে প্রকাশ্যেও থাকে এবং গোপনেও থাকে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, আখেরী জামানায় যখন পাশ্চাত্য জাতি সমূহ ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং মুসলমানদিগের অর্থ-নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবে এবং তাহাদের রাজ্য সমূহ দখল করিয়া ফেলিবে, তখন উহা তাহারা ধুকাবাজী ও ছলনা দ্বারা সাধিত করিবে ; বাহ্যতঃ তাহারা ইহাই দেখাইবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা শিখাইবার জন্য আসিয়াছে, কিন্তু প্রকারন্তরে তাহাদের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরে ওসওসা সৃষ্টি করাই হইবে, যাহাতে মানুষ খোদা ও রসুল (সাঃ) সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা গোপন চাল চালাইবে।

وسواس (ওসওয়াস)-এর অর্থ গহনার ঝঙ্কারও হইয়া থাকে। এজন্য من شر الوسواس الخناس -এর মধ্যে এই ইংগিতও দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত জাতি সমূহ গোপন তৎপরতার ভিতর দিয়া জিন এবং মানুষের দ্বারা—অর্থাৎ, কখনও বড় লোকের মাধ্যমে এবং কখনও সাধারণ মানুষের মাধ্যমে টাকা পয়সার লোভ দেখাইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিবে।

ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আখেরী জমানার ফেৎনা গুলিতে 'সংগঠন' (Organisation) থাকিবে—মানুষ খণ্ড খণ্ড বা ব্যক্তিগতভাবে উহাতে লিপ্ত হইবে না বরং নিজেদের সঙ্গে অন্যান্যদিগকেও মিলাইবে এবং উনকানী দিবে।

এই সুরার প্রথমে খোদাতায়ালার তিনটি সেফতের উল্লেখ করা হইয়াছিল, যাহা মানুষের তিনটি অবস্থা—জন্ম-কাল, জীবনকাল এবং মৃত্যু-কালের সহিত সম্পর্ক রাখে, এবং বলা হইয়াছিল যে, উক্ত সেফত সমূহের ফয়েয ও কল্যাণ হইতে যেন আমরা কোন স্তরেও বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য দোয়া করিতে থাকা উচিৎ। এখন আলোচ্য (من شر الوسواس الخناس) আয়াতে সেই সকল ওসওসার দিকে ইঙ্গিৎ করা হইতেছে, যাহা উক্ত অবস্থাত্রয়ের মধ্যে মানুষের মনে দানা বাঁধিয়া আল্লাহতায়ালার সহিত তাহার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। যেমন, কখনও মনে এই ধারনা আসিতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা বলিতে কেহ নাই ; কখনও এই সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, মানুষের সৃষ্টির পিছনে কোন উদ্দেশ্য নাই ; আবার কখনও ইহা যে, এমন সত্বা বা শক্তি নাই যিনি শাস্তি বা পুরস্কার দিতে বা কর্মফল সম্পাদন করিতে সক্ষম ; তেমনিভাবে কখনও উলুহিয়ত (ঈশ্বরত্ব) সম্বন্ধে এই ওসওসার উদ্রেক হয় যে, এবাদতের খোদাতায়ালার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে।

কুরআন করীম পাঠ শেষে মনুষের মনে এই অহঙ্কার জন্মাইতে পারিত যে, এখন সে শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত ও নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআনের শেষে বলিলেন যে, হে বান্দা ! এমন যেন না হয় যে, যখন তুমি কুরআন পাঠ করার ফলে খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের পাত্র হও, তখন তুমি অহংকারে লিপ্ত হইয়া হোচট খাও। তোমার স্মরণ রাখা উচিৎ যে, খোদাতায়ালা ত

رب الناس (রব্বুন নাস), তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ মানুষের উপরেও বর্ষিত হইয়াছে; যদি তোমার অন্তরে এলাহী ফয়য ও কল্যাণ লাভ করার আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার রুবুবিয়তের অধীনেই হইয়াছে। এজন্য তোমার প্রত্যেক প্রকারের হোচট বা পদস্খলন হইতে বাঁচার জন্য দোয়া করা উচিত।

তেমনিভাবে, কোন কোন কুরআনের পাঠক কুরআন শেষ করিয়া খোদাতায়ালার খোদ্দাম অর্থাৎ সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যেন আল্লাহ্‌র 'সরকারের অফিসার' হিসাবে নিয়োজিত হয়। সেই সময়ও পদস্খলনের আশংকা থাকে; এজন্য বলা হইয়াছে যে, ملك الناس হে খোদা! আমি ইহা হইতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি যে, যখন আমার উপর তোমার সেইরূপ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, যেরূপ অফিসারগণের উপর বাদশাহ্‌র তরফ হইতে হইয়া থাকে, তখন কিনা আমিত্ব ও অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া নিজকে মহৎ ভাবিয়া তোমার নৈকট্য ও অনুগ্রহ হইতে বিতাড়িত হইয়া পড়ি।

কখনও কোরআনের পাঠক আল্লাহ্‌তায়ালার বিশিষ্ট আবেদগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সেই সময়ে তাহার উপর অন্যদের তুলনায় বেশী ফজল নাযেল হইতে থাকে। তখন সে সহসা মনে করিতে পারে যে, সে যেন মহৎ কিছু হইয়া গিয়াছে, ফলে সেই শিক্ষা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, যদ্বারা সে ঐ দরজা ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। এইজন্য বলা হইয়াছে, الله الناس

—ইহা সম্ভবপর যে, কোরআন পাঠের ফলে তুমি সেই মোকাম লাভ কর, যাহার জন্য খোদাতায়ালার দরবারে অব্দুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র আব্দ) বলিয়া আখ্যায়িত হও; কিন্তু সে সময়ও তোমার এই দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার মাবুদ হওয়ার দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, সেই সময়ও যেন আমরা তোমা হইতে মুখ না ফিরাই, বরং তুমি আমাদিগকে চিরকালের জন্যই তোমার আব্দ্‌ হিসাবে কায়েম রাখ। (আমীন)।

—(০)—

সাহাবা (রাঃ)এর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ নিজেদের সম্মুখে রাখ

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সাহাবা (রাঃ)-এর সমূহ দৃষ্টান্ত নিজেদের সম্মুখে রাখ। দেখ, তাঁহারা যখন পয়গম্বরে-খোদা (সাঃ)-এর পয়রবী করিলেন এবং দীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রগন্য করিলেন, তখন যে সকল ওয়াদা আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের জন্য করিয়াছিলেন, তাহা যাবতীয়ই পূর্ণ হইল।

(আল-হাকাম, ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০১ ইং)

হাদিস শরীফ

স্বপ্ন ও তাহার তাবীর

হযরত সামোরা বিন জন্দব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও সাল্লাম প্রভাতের নামাযের পর সাধারণতঃ নিজ সাহাবা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা? কেহ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে, তিনি বর্ণনা করিয়া দিতেন। একদিন প্রভাতে তিনি নিজের স্বপ্ন শুনাইলেন। অদ্য রাত্রে আমার নিকট দুই ব্যক্তি (জিবরাঈল ও মীকাইল) আসিলেন এবং বলিলেন, চলুন আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি। তদনুযায়ী আমি তাঁহাদের সহিত চলিলাম। তাঁহাদের সহিত চলিতে চলিতে আমরা এমন এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে চিৎ হইয়া শুইয়াছিল এবং অপর এক ব্যক্তি প্রস্তর হস্তে তাহার নিকট দণ্ডায়মান ছিল। সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির মস্তকে সজোরে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার মস্তককে চূর্ণ করিতেছিল। প্রস্তর আঘাত খাইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছিল এবং পুনঃরায় সেই ব্যক্তি ঐ প্রস্তরটি কুড়াইয়া লইতে অগ্রসর হইতেছিল; ইত্যাবসরে শায়িত ব্যক্তির মস্তক ঠিক হইয়া যাইতেছিল। পুনঃরায় সে তাহার মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিতে ও তাহার মস্তককে চূর্ণ করিতেছিল। মোট কথা, অবিরাম এই প্রক্রিয়া চলিতে ছিল। আমি সুবহান আল্লাহ্ পড়িলাম এবং অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি হইতেছে? আমার সঙ্গীগণ বলিলেন, আগে চলুন। অর্থাৎ এখন এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার অনুমতি নাই। সুতরাং আমরা আগাইয়া চলিলাম। অতঃপর এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলাম, যে ঘাড় কাৎ করিয়া শুইয়াছিল এবং অপর এক ব্যক্তি লোহার আকড়া লইয়া তাহার পার্শ্বে খাড়া হইয়া তাহার চোয়াল চিরিতেছিল। সে শায়িত ব্যক্তির একদিকের চোয়ালে আকড়া লাগাইয়া গ্রীবাদেশ পর্যন্ত চিরিয়া দিতেছিল। এই ভাবে তাহার নাকের রন্ধ্রদেশ এবং চক্ষুদ্বয়কেও পশ্চাৎ পর্যন্ত চিরিয়া দিতেছিল। অতঃপর তাহার অপর দিকও অনুরূপভাবে চিরিয়া দিতেছিল। তাহার এক পার্শ্ব চিরিয়া অবসর হইতে না হইতে তাহার অপর পার্শ্ব ঠিক হইয়া যাইতেছিল। তখন আবার সে নূতন করিয়া তাহার চিরাই করিতে ছিল। আমি এই ঘটনা দেখিয়া 'সুবান আল্লাহ্' পড়িলাম এবং অবাক হইয়া বলিলাম, "এ কি হইতেছে?" আমার সঙ্গীগণ বলিলেন, "চলুন, চলুন।" তখন আমি তাঁহাদের সহিত আগাইয়া চলিলাম। এক স্থানে পৌঁছিয়া আমরা এক বড় তুন্দুর দেখিলাম। উহার মধ্যস্থিত লেলীহান অগ্নিশিখার কারণে দগ্ধমান বস্তু

হইতে ভীতিপ্রদ শব্দ উত্থিত হইতেছিল। উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করিলাম। উহার মধ্যে বহু পুরুষ এবং স্ত্রীকে উলঙ্গ অবস্থানরত দেখিলাম। যখন অগ্নিশিখা তাহাদের তলদেশ হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তখন উহার ঠেলায় তাহারা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল ও অসহায় বিলাপ ধ্বনী দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল মথিত করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এরা কাহারা। আমার সঙ্গী গণ বলিলেন, "চলুন, চলুন।" সুতরাং আমরা আগাইয়া চলিলাম। আমরা এক রক্তবর্ণ নদীর তটে পৌঁছিলাম। সেই নদীতে এক ব্যক্তিকে সাঁতার কাটিতে দেখিলাম। নদীর তীরে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। সে অনেক প্রস্তর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। যখন সন্তরণশীল ব্যক্তি সাঁতার দিতে দিতে হাপাইতে হাপাইতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ হাঁ করিয়া তীরের নিকট পৌঁছিতেছিল, তখন তীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাহার মুখের উপর সজোরে প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতেছিল এবং সে উহার ধমকে যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে ছিল। এই প্রক্রিয়া এই ভাবে চালু ছিল। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি ব্যপার? আমার সঙ্গীগণ বলিলেন, চলুন, চলুন। সুতরাং আমরা আগাইয়া চলিলাম। অতঃপর আমরা একান্ত এক কুৎসিৎ মানুষকে দেখিলাম; তাহার পার্শ্বে আগুন জ্বলিতেছিল। ইন্ধন নিকটেই রাখা ছিল। সে ঐ আগুনের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল এবং উহার মধ্যে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছিল। আমি অবাক হইয়া আমার সঙ্গিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি হইতেছে? তাঁহারা বলিলেন, চলুন চলুন। আমরা চলিতে লাগিলাম। আমরা এক ঘন বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উহার মধ্যে বসন্তের সর্ব প্রকার ফুল ফুটিয়া ছিল এবং বাগানের মধ্যখানে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এত লম্বা ছিলেন যে মনে হইতেছিল তিনি যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছিলেন। তাঁহার চর্তুপার্শে এত অধিক সংখ্যক বাচ্চা জমা ছিল যে, আমি এত অধিক সংখ্যক সমাবেশ কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বুজোর্গ ব্যক্তি কে? এবং এই বাচ্চারা কাহারা? আমার সঙ্গিগণ বলিলেন, চলুন চলুন। আমরা চলিতে লাগিলাম। আমরা এক বৃহৎ বৃক্ষের নিকট পৌঁছিলাম। এত বড় এবং সুন্দর গাছ আমি কখনও দেখি নাই। আমার সঙ্গীগণ বলিলেন, এই বৃক্ষে আরো হন করুন। তদনুযাই আমরা গাছে চড়িতে লাগিলাম এবং চড়িতে চড়িতে এমন এক শহরে পৌঁছিলাম, যাহা স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত ছিল। যখন আমরা ঐ শহবের দরজা খুলিতে বলিলাম, বলা মাত্র দরজা খুলিয়া গেল। আমরা শহরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমরা এরূপ মানুষ দেখিলাম, যাহাদের অর্ধেক দেহ একান্ত সুন্দর এবং বাকী অর্ধংশ একান্ত কুৎসিৎ। আমার সঙ্গীগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য

করিয়া এক নদীর দিকে ইশারা করিয়া বলিল, ঝাঁপাইয়া পড়। নদী খুব বৃহৎ এবং খর স্রোতা ছিল। পানি একান্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল ছিল। কথা শুনিয়া তাহারা নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল এবং যখন নদী হইতে তাহারা উঠিয়া আসিল, তখন তাহাদের দেহের অর্ধাংশের কুরূপ চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা দেখিতে সর্বাঙ্গীন সুন্দর লাগিতেছিল। আমার সঙ্গীগণ আমাকে বলিল যে, ইহাই জান্নাতে আদন্, এখানেই আপনার বাসস্থান নির্ধারিত আছে। ঐ দেখা যায় আপনার মহল। আমি উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, এক শুভ্র মেঘের ন্যায় সমুজ্জল এক মহল। আমি তখন আমার সঙ্গিগণকে বলিলাম, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের ভাল করুন, আপনারা আমাকে এই মহলে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিন। তাঁহারা বলিলেন, এখন না। অবশ্যই কিছুকাল পরে আপনি ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই যাইবেন।" অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, আজ রাত্রে আমি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছি কিন্তু সেগুলির তাৎপর্য কিছু বুঝি নাই। আমার সঙ্গীগণ বলিলেন "আপনি প্রথমে যে, ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন যাহার মস্তক প্রস্তর দ্বারা চুর্ণ করা হইতেছিল, সে এমন এক ব্যক্তি যে, কুরআন পড়িয়াছিল, কিন্তু উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সে শুইয়া থাকিত এবং ফযরের নামাজ পড়িত না। দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, চোয়াল নাসারন্ধ্র এবং চক্ষুদ্বয় যাহার চিরাই করা হইতেছিল, সে প্রভাতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গুরুতর মিথ্যা রটনা প্রচার করিত, এবং ঐ রটনা সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িত। আপনি যে সকল উলঙ্গ পুরুষ এবং মেয়েদিগকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত। যে ব্যক্তি নদীতে সাঁতার দিতেছিল এবং তীরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি তাহার মুখে প্রস্তার নিক্ষেপ করিতেছিল সে সুদখোর ছিল। যে কুৎসিৎ ব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া উহার মধ্যে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতেছিল, সে দোজোখের দারোগা ছিল। যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে আপনি বাগানে দেখিয়াছিলেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন এবং যে সকল বাচ্চা তাঁহাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহারা অল্প বয়সে মারা-গিয়াছিল এবং দীনে ফিতরতের উপর কায়েম ছিল। তাহাদের তরবিয়তের ভার এখন আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর সোপর্দ করা হইয়াছে। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাস করিলেন, "হে আল্লার রসুল, মোশরেকগণের বাচ্চাগণও কি তাহাদের শামিল হইবে?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "হাঁ তাহারাও ইহাদের অন্তর্ভূক্ত।" আমার সঙ্গী ফেরেশতাগণ আরো বলিলেন যে, আপনি শহরে যে, সকল লোককে অর্ধাংশ সুন্দর এবং অর্ধাংশ কুৎসিত দেখিয়াছিলেন, তাহারা ঐ সকল লোক, যাহারা কতক মন্দ এবং কতক ভাল কাজ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের নেকীর কল্যাণে তাহাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করিয়া-দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ধৌত করিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করিয়াছেন। (বুখারী)।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

এতায়াতের গুরুত্ব ও তাহার মাপকাঠি

(১)

ইহা সত্য কথা যে, কোন কৌম, কৌম রূপে আখ্যায়িত হইতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে মিল্লত, ঐক্য ও সংহতির প্রাণ সঞ্চারিত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ফর্মাবরদারীর মূল-নীতি গ্রহণ করে। যদি মতানৈক্য ও মতবিরোধ বিরাজ করে তাহা হইলে মনে করিবে যে, ইহা অধঃপতনের লক্ষণ। মুসলমানদের দুর্বলতা এবং পতনের অন্যান্য কারণ সমূহের মধ্যে মতানৈক্য ও অভ্যন্তরীন বিরোধ ও বিবাদও একটি। যদি তাহারা মতানৈক্য পরিত্যাগ করে এবং একজনকে মানিয়া চলে, যাহার এতায়াত করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ দিয়াছেন, তাহা হইলে যে কাজে তাহারা হাত দিবে বা তাহা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার হাত জামাতের (ঐক্যবদ্ধ দলের) উপর থাকে। ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তৌহিদকে ভাল বাসেন। এবং ওহ্‌দাত (ঐক্য) কায়েম হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না (সর্বমান্য ও অবশ্য মাননীয় একজন ইমামের) এতায়াত করা হয়। (আল-হাকাম, ৫নং, ১৯০১ ইং)

(২)

"কোন কৌম এবং জামাত তৈয়ার হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের ইমামের আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য বিশেষ প্রকারের জোশ (প্রাণ চঞ্চলতা), এখলাস (নিষ্ঠা) এবং ওফা (বিশ্বস্ততা) না থাকে।"

(আল-হাকাম ৩১শে জুলাই ১৯০৬ইং)

(৩)

"আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, বলগাহীন বেপরওয়া ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা কখনও কল্যাণ ও আশিস এবং বরকতের মুখ দেখিতে পারিবে না। সুতরাং নেক নিয়তের সহিত এবং পুরাপুরি এতায়াত ও আনুগত্যের রঙে খোদা এবং তাঁহার রসুলের নির্দেশাবলীর উপর আমল করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও, কেননা ইহার মধ্যেই মঙ্গল রহিয়াছে।"

(আল-হাকাম, ১২ই মে, ১৮৯৯ইং)

(৪)

"এতায়াত (আনুগত্য) এমন এক জিনিষ যে, যদি ইহা সাচ্চা দেলের সহিত পালন করা হয়, তাহা হইলে অন্তরে এক নূর এবং আত্মায়

এক সজীবতা এবং জ্যোতি আসে। মোজাহেদাত (কঠোর এবাদত ও যেকের-আযকার)-এর এত প্রয়োজন নাই, যতখানি এতায়াতের প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে শর্ত্ত এই যে, এতায়াত সত্যকার হইতে হইবে। ইহাই একটি সুকঠিন কাজ। এতায়াতের মধ্যে নিজের বাসনা কামনা ও কুপ্রবৃত্তিকে জবাই করিয়া ফেলা জরুরী হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে এতায়াত হইতে পারে না। প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনাই এমন এক জিনিষ, যাহা বড় বড় তৌহীদ অনুসারীর অন্তরেও প্রতিমা স্বরূপ হইতে পারে। সাহাবা (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম), যাঁহারা জালালী ও জামালী রং সমূহকে আহরণ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন এক আকর্ষন ও শক্তি ছিল, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে হৃদয় গুলিকে আকৃষ্ট করিত। অধিকন্তু হযরত নবী (সাঃ)-এর জামাত রসুলের এতায়াত ও আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সত্যে ও পূণ্যে দৃঢ়তা এমন অপূর্ব ও অলৌকিক প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, যাহারাই তাঁহাদিগকে দেখিত, তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে তাঁহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আসিত।

মোট কথা, সাহাবা (রাঃ)-এর মত (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) অবস্থা এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা এই জামাতকে, যাহা মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা তৈয়ার হইতেছে, সেই জামাতের সহিত শামিল করিয়াছেন, যাহা হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) গঠন করিয়াছিলেন। যেহেতু জামাতের উন্নতি এইরূপ ব্যক্তিগণের নমুনার ফলেই হইয়া থাকে, এজন্য তোমরা যাহারা মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জামাত বলিয়া সাহাবার জামাতের সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ কর, তোমরা নিজেদের মধ্যে সাহাবার রঙ পয়দা কর—এতায়াত করিতে হইলে তাঁহাদের মত করিতে হইবে এবং পরস্পর প্রীতি ও ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপন করিতে হইলে অনুরূপ করিতে হইবে। মোট কথা, প্রত্যেক রঙে, প্রত্যেক আকার-আকৃতিতে, তোমরা সেই রূপ ও রঙকে গ্রহণ ও আহরণ কর, যাহা সাহাবা (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম)-এর ছিল।

(আল-হাকাম, নং৫, ১৯০১ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসুল এবং তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী (নেযাম পরিচালনায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তি)-গণেরও। যদি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে (নিজেদের রায় পরিত্যাগ করিয়া) আল্লাহ ও রসুলের (সিদ্ধান্তের) দিকেই উহাকে ফিরাইয়া দাও, যদি কিনা তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হইয়া থাক। ইহাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।"

(আল-কোরআন)

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্রবাণী

নেক (পূন্যবান) ব্যাক্তিগণের সাক্ষাৎ এবং ধর্মীয় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে সফর করা অনেক সওয়াব ও মহাপুরস্কার লাভের কারণ হয়।

"এই অধমের হস্তে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দ্বারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট সকল খাঁটি নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবগতির জন্য প্রকাশ যে, বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য, দুনিয়ার প্রেম যেন নিষ্প্রভ হয় এবং প্রভু আল্লাহ্তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার নির্লিপ্ততা ও আত্ম-বিলীনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমার সাহচর্য্যে ও সংস্পর্শে থাকা এবং নিজ জীবনের একাংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যকীয়, যাহাতে আল্লাহ্ চাহিলে, কোন সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে দুর্বলতা ও উদাশীনতা এবং শিথিলতার বিলুপ্তি ঘটে, এবং 'কামেল একীন' (পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়) জন্মিয়া স্বতস্ফূর্ত্ত ও অনুরাগের সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি সর্বদা উদগ্রীব থাকা উচিত এবং দোয়া করা দরকার, আল্লাহ্তায়ালা যেন ইহার তৌফিক প্রদান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই তৌফিক হাসেল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করা উচিত। কেননা বয়াতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর আর সাক্ষাতের পরোয়া না রাখা এরূপ বয়াত সম্পূর্ণ বেবরকত ও আশীষ বিহীন এবং একটি আনুষ্ঠানিক প্রথা স্বরূপই হইবে। এবং যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বভাবগত দুর্বলতা বা সামর্থের অভাব, অথবা সফরের দূরত্ব বশতঃ সাহচর্য্যে আসিয়া থাকার, কিম্বা, বৎসরে কয়েকবার সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া আসার সুযোগ-সুবিধা নাও হইতে পারে, (কেননা অধিকাংশের হৃদয়ে এখনও এরূপ আগ্রহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান নহে যে, সাক্ষাতের জন্য তাঁহারা বড় বড় কষ্ট ও ক্ষতি বরণ করিতে পারেন) সেজন্য সমিচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৎসরে কয়েকদিন জলসার জন্য নির্ধারিত হউক, যাহাতে সকল মুখলেসীন, আল্লাহ্তায়ালা যদি ইচ্ছা

করেন, তাঁদের স্বাস্থ্য ও অবসর থাকিলে এবং বিশেষ অন্তরায় না থাকিলে নির্ধারিত তারিখ-গুলিতে উপস্থিত হইতে পারেন। তদনুযায়ী যথাসাধ্য সকল বন্ধুর একমাত্র আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি শুনিবার জন্য এবং দোয়ার অংশীদার হইবার জন্য উক্ত তারিখে অবশ্য উপস্থিত হওয়া উচিত।

এই জলসায় 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যাদি এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী) শুনাইবার ব্যবস্থা থাকিবে যাহা ঈমান মা'রেফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।

সেই (যোগদানকারী) বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া এবং তওয়াজ্জো (আত্মসংযোগ) নিয়োজিত থাকিবে এবং সর্বাধি কৃপালু (আরহামুর রাহেমীন) আল্লার দরবারে যথাসাধ্যভাবে চেষ্টা করা হইবে, আল্লাহুতায়ালা যেন নিজ দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন ও নিজ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কবুল করেন এবং পবিত্র পরিবর্ত্তন ও সিদ্ধি তাহাদের মধ্যে আনয়ন করেন।

একটি আনুসঙ্গিক উপকার এই জলসাগুলিতে ইহাও হইবে যে, প্রত্যেক নূতন বৎসরে যতজন নবদীক্ষিত ভ্রাতা এই জমাতে দাখিল হইবেন তাঁহারা নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পূর্ববর্তী উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারিবেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয় ও প্রীতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যে ভ্রাতা মধ্যবর্ত্তীকালের মধ্যে এ নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এ জলসায় তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করা হইবে।

সকল ভ্রাতাদিগকে রুহাণী ভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্য হইতে শুষ্কতা ও অপরিচেয়ের দূরত্ব এবং নেফাক (কপটতা) নিরসনের জন্য মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিশেষ (দোয়ার দ্বারা) চেষ্টা করা হইবে।

এই রুহাণী (আধ্যাত্মিক) জলসার আরো বহুবিধ রুহাণী ফায়দা এবং উপকারাদী রহিয়াছে, যাহা ইন্‌শাআল্লাহুল কাদীর, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রাতাগণের পক্ষে সমীচিন হইবে, বৎসরের প্রথম হইতেই জলসায় যোগ-দানের বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া এবং যদি তদবীর এবং সঞ্চয় পরায়ণতার মধ্য দিয়া অল্প অল্প করিয়া পুঞ্জি সফর খরচের জন্য জমাইতে থাকেন তাহা হইলে অনায়াসে (সফর খরচের) পুঞ্জি যোগাড় হইয়া যাইবে, যেন বিনা পয়সাই সফরের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

("আসমানী ফায়সালা"—১৮৯১ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৩, মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত খুতবার একাংশ)।

জামাত আহমদীয়া সমগ্র মানব জাতিকে উম্মতে ওয়াহেদায় একীভূত করার মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জামাত আহমদীয়া সমগ্র বিশ্বে এক ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছে—ইহা আজিকার জীবনের একটি বাস্তব সত্য।

বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আহমদী জামাত সমূহকে নিকট হইতে নিকটতর আনয়নের জন্য জোরদার প্রচেষ্টা জারী রাখিতে হইবে।

আর একটি জরুরী কথাও এখন আমি বলিতে চাহি। কেননা আর অপেক্ষা করা যায় না। এজন্য আমার শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি সেই কথাটি একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে চাই।

যেরূপ পূর্বেও আমি বলিয়াছি যে, এক সময় ছিল যখন কাদিয়ানের বাহিরে দুই একটি পরিবার হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সহিত পরিচিত ছিল এবং তাঁহার মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে জানিত। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা অনুগ্রহ করিলেন, ফলে কাদিয়ানের পারিপার্শিকতায় জমাত বিস্তার লাভ করিল। তারপর পাঞ্জাবে ছড়াইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর অবিভক্ত ভারতবর্ষে ছড়াইতে লাগিল। অতঃপর এলাহী সুসংবাদ অনুযায়ী বহির্দেশে বিস্তার লাভ করিল। কিন্তু ১৯৪৪ইং পর্যন্ত ভারত বর্ষের বাহিরের জামাত সমুহ মালী কুরবাণীতে অনেক পিছনে ছিল। এমনকি তাহারা উল্লেখযোগ্যও ছিল না অর্থাৎ তাহাদের পৃথক কোন খতিয়ান ছিল না। আয়-ব্যয়ের কোন রেজিষ্টার ছিল না খরচ পত্রের কোন বাজেট তৈয়ার হইত না। মোট কথা, তাঁহাদের মালী কুরবানী না হওয়ার সমান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে হয়ত শতকারা ৯৯ জনই অর্থাৎ গরিষ্ঠ সংখ্যায় তাহারাই ছিলেন যাহারা ভারত বর্ষের বাহিরে বিভিন্ন দেশে বসবাস করিতে ছিলেন এবং সেখানেই অর্থ উপার্জন করিয়া সানন্দে খোদাতায়ালার পথে মালী কুর্বানী পেশ করিতেছিলেন। অতঃপর ১৯৪৪ সনে প্রথম বারের মত বহির্দেশের জামাত

সমূহের মালী কুরবানী বাজেটের মাধ্যমে স্পষ্টতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া জামাতের সামনে আসিতে আরম্ভ করিল এবং প্রত্যেক বৎসর বাড়িয়া চলিল, এমনকি আমার মনে হয় যদি এখন প্রত্যেক প্রকারের সকল মালী কুরবানী একত্র করা হয় তাহা হইলে তাহ্‌রীকে জদীদের শতকারা ৫ জনেরও বেশী মালী কুরবানী বহির্দেশের জামাত সমূহ পেশ করিতেছে। মোট কথা, বিপুল প্রসারতার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং এখন আমি সেই প্রসারতা সম্বন্ধেই বলিতেছি। মালী কুরবানীর বিষয়ে যাইতেছি না। শুধু উক্ত প্রসারতা ব্যক্ত করার জন্য আমি মালী কুরবানীর কথা বলিয়াছি।

সুতরাং নাইজেরিয়া, যাহা একটি অনেক বড় দেশ, সেখানে আমাদের বড় বড় জামাত স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখানে বড় বড় অফিসার এমনকি প্রদেশ সমূহের মন্ত্রী পর্যায়ে আহ্‌মদী রহিয়াছেন এবং অত্যন্ত এখলাস রাখেন। সেখানে এরূপ অবস্থা নয় যে শুধু দুই একটি পরিবার আহমদী—যেমন কিছু কাল পূর্বে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সুডানে একটি আহ্‌মদী পরিবার আছে। কিন্তু সেখানে এখনও জামাত হয় নাই। কিন্তু নাইজেরিয়াতে বড় বড় জামাত রহিয়াছে এবং সমগ্র দেশ ব্যাপী ছড়াইয়া আছে। তেমনিভাবে ঘানায় ৩০ লক্ষের আবাদীর মধ্যে তিন লক্ষের উর্ধে প্রাপ্ত বয়স্ক আহমদী পুরুষ ও মহিলা রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া ছেলে মেয়ে ও রহিয়াছে যাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। এখানের জামতও একটি সুবৃহৎ জামাত, যাহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়া আছে। তেমনি ভাবে সিরালিউনেও বেশ বড় বড় জামাত রহিয়াছে। তাহাছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশ আছে, যেখানে নাইজেরিয়া এবং ঘানার ন্যায় বড় বড় জামাত না থাকিলেও সেখানে বড় দ্রুততার সহিত জামাত আহ্‌মদীয়া সফলতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। তথাকার মানুষের মধ্যে অতি তীব্রভাবে এই অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে যে, যদি আমরা হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ সমূহে অংশীদার হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের আহ্‌মদীয়া জামাতে শামিল যাওয়া উচিত।

তেমনিভাবে ইংল্যাণ্ডেও খোদাতায়ালার ফজলে সুবৃহৎ জামাত রহিয়াছে। যদিও সংখ্যার দিক দিয়া তত বড় ত নয়, যত বড় আফ্রিকার জামাত সমূহ রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের কর্মতৎপরতার দিক দিয়া বৃহৎ জামাতের মধ্যে পরিগনিত হইতে পারে। ইংল্যাণ্ডের জামাত সমূহ নুসরতজাহান রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য অন্যান্য চাঁদা ব্যতীত সাড়ে বার লক্ষ টাকার ওয়াদা করিয়াছিল, যাহার মধ্যে এগার লক্ষেরও উপরে তাহারা আদায় ও করিয়া দিয়াছে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ইসলামের স্বপক্ষে একটি অনুকুল আবহওয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। আমেরিকায় এত মুখলেস জামাত সমূহ রহিয়াছে যে, আপনারা তাহাদের সম্বন্ধে

আন্দাজও করিতে পারিবেন না। সেখান হইতে যে সকল রিপোর্ট আসে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এমেরিকান অধিবাসীগণ জামাতে শামিল হইতেছেন (এখান হইতে চাকুরী ইত্যাদির ব্যাপারে যাহারা সেখানে গমন করেন, তাঁহাদের কথা আমি বলিতেছি না)। সুতরা, সেখানেও অত্যন্ত মুখলেস জামাত সমূহ কায়েম হইয়াছে। তেমনিভাবে ইন্দোনেশীয়ায় অনেক বড় বড় জামাত রহিয়াছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও অতি দ্রুত গতিতে প্রসার দেখা যাইতেছে। মরিশাসেও ঠিক একই রূপ অবস্থা।

মোট কথা, সমস্ত জগতে বিভিন্ন দেশে এখন হয় বড় বড় জমাত রহিয়াছে অথবা সংখ্যার দিক দিয়া তুলনামূলকভাবে ছোট জমাত হইলেও ইহা সুস্পষ্ঠ যে, ইসলাম প্রচারের কাজে অত্যন্ত ব্যপকতার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি যে, এক সময়ে ইংরেজদের দাবী ছিল (সত্য ছিল কিম্বা মিথ্যা) যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের উপর সূর্য অস্ত যায় না, কিন্তু তাহারা আজ এই দাবী করিতে পারে না, কেননা কমনওয়েলথ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন একটি নুতন আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ জামাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং উহা হইল 'জামাতে আহ্‌মদীয়া ইসলামিয়া', যাহা ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার অভিযানে নিয়োজিত এবং এই দাবী করিতে পারে যে, তাহার উপর সূর্য অস্ত যায় না। কেননা জামাতে আহ্‌মদীয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং, ইহা জীবনের একটি বাস্তবতা, যাহা আমাদের ভুলা উচিত নয়—জমাতে আহ্‌মদীয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এক ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছে। সমস্ত জগতে জামাত বিস্তৃত হইয়াছে; অনেকগুলি দেশে বৃহৎ সংখ্যায় জামাত আহমদীয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; বহু সংখ্যক জামাত অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। ইহা জীবনের একটি বাস্তব সত্য, এবং দ্বিতীয় বাস্তব সত্যটি এই যে, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমার আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত মানব জাতিকে হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পতাকার নীচে উম্মতে ওয়াহেদা (একটি মাত্র উম্মত)-এর আকারে যেন একত্র করা হয়, অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার বা একই উম্মত ভূক্ত হয়। যদিও এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুকঠিন, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে জামাতের কর্ম তৎপরতা, উহার প্রসার ও বিস্তৃতি ক্রমবর্ধমান ও গতিশীল। মোট কথা, জীবনের বাস্তব সত্যের একটি দিক—জামাত জগৎব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছে। জীবনের বাস্তব সত্যের দ্বিতীয় দিকটি হইল এই যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পৃথিবীর উপর বসবাসকারী সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ঝাণ্ডার নীচে সমবেত করা। যাই হউক, বর্তমানকালের জীবনে ইহা একটি বাস্তব

সত্য এবং তাহা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, আমরা যেন স্থানের দূরত্বকে এমন রূপ পরিগ্রহ করিতে না দেই, যাহার ফলে সমগ্র জগতকে "উম্মতে ওয়াহেদায়" পরিণত করিবার নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সিথিলতার সৃষ্টি হইয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আহ্‌মদী জামাত সমূহকে নিকট হইতে নিকটতর করনের জন্য একটি জোরদার প্রচেষ্টা জারী থাকিতে হইবে। ইহা একটি অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। অন্যথায় আশংঙ্কা আছে যে, খোদা না করুন, তাহাই না ঘটে, যাহা পূর্বে ঘটিয়াছিল, যখন মুসলমানগণের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন গণ্ডির মধ্যে বিভক্ত হইল, তখন ইসলামের সেই শান ও শৌকত থাকিল না, যাহা সে প্রাথমিক যুগে লাভ করিয়াছিল। এখন পুনঃরায় আল্লাহতায়ালা চাহিয়াছেন যে, ইসলাম অত্যন্ত বিপুল ও ব্যাপকভাবে চুড়ান্ত বিজয় লাভ করুক। মোট কথা, ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাধ্যান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধের প্রথমেই বিজয় সংঘঠিত হয় না; যুদ্ধের শেষে বিজয় সাধিত হয়। এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধ আঁ-হযরত (সাঃ) এর জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়াছিল। অতঃপর খলাফায়ে-রাশেদীনের জীবদ্দশায় বিজয় সমূহ সাধিত হইতে থাকে। তারপর উহাদের ধারাবাহিক গতি অব্যহত থাকে; এমনকি ইসলাম আরব ও আজমের দূর-দূরান্ত দেশ সমূহে ছড়াইয়া পড়ে। একদিকে ইউরোপ পর্যন্ত চলিয়া যায়, অন্যদিকে তুর্কি এবং উহাও অতিক্রম করিয়া ইউরোপের অন্যান্য অংশে, যেমন পোলেণ্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রাশিয়ায় এক কালে বার খাওয়ানীন (পাঠানদের পরিবার) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আকারে স্বয়ং মস্কোর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছে। তারপর চীনেও মুসলমানরা গমন করে। কিন্তু সেখানে এত বেশী প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এক ব্যাপক আকারে সমস্ত মানব জাতিকে একত্রিকরনের মহাসংগ্রাম জারী হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা হইতেও ব্যাপকতর আকারে ইসলাম বিজয় লাভ করিবে। কেননা শয়তানী শক্তিসমূহের সহিত ইসলামের ইহাই চুড়ান্ত ও সফল যুদ্ধ হিসাবে সাব্যস্ত হইয়া আছে। কেননা সেই কালে আমেরিকাকে কেহ জানিত না, অষ্ট্রেলিয়াকে কেহ জানিত না, নিউজিল্যাণ্ড সম্বন্ধে কাহারও খবর ছিল না, ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক জগতের অন্যান্য অংশের সহিত খুব কমই ছিল। তেমনিভাবে ফিজি আইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ইত্যাদির কোন সম্পর্কই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ছিল না। কিন্তু এখন বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের অপরাপর দেশের সহিত সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে। এজন্য এখন যেখানে যেখানে আল্লাহতায়ালা আমাদের জামাতের পা মজবুত করিয়া দিতেছেন, সেখানেই আমাদের

(২৪০এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আহমদীয়তের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

—মোঃ খলিলুর রহমান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নৈরাশ্যের প্রধানতঃ চারটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, কোন কোন লোক বিপদ আপদ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত এবং কল্পিত ধারণা পোষণ করে সেই সংগে ঈমানের দুর্বলতার জন্য ঐশী-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রবন হয়। কিন্তু একজন সত্যিকার মোমেনের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হওয়া উচিৎ যে, বিপদ যত বেশী কঠিন বলে মনে হবে, ততোধিক নিজ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে সেই বিপদকে জয় করার জন্য। আর ঐশী-প্রতিশ্রুতি গুলোকে খেলার পুতুল মনে না করে এগুলোর পূর্ণতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ এমনিভাবে ঐশী প্রতি-শ্রুতিতে বিশ্বাস রাখতেন যে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করতেও ইতঃস্ততঃ করতেন না এবং নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখে ভীত না হয়ে মৃত্যুর মাঝে স্বর্গের দৃশ্য অবলোকন করার ন্যায় যে-কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতেন। ফলে পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে কিভাবে বিদ্যুত গতিতে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ মাত্র অর্ধ-শতাব্দীতে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল! কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যেক বিপদের ছায়া দেখেই হতাশ হয়ে পড়ে, সে যদি আহমদীয়াতের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তাহলে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ারই কথা। তাই এ ধরনের লোকরাই বিপদ দেখলেই মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা বোধ করে এবং সহজেই নৈরাশ্যের জালে বিদ্ধ হয়। প্রকৃত মোমেনের দৃষ্টিভঙ্গি কখনই এরূপ হতে পারে না। আল্লাহতায়ালা ক্ষুদ্র পরমানুর মধ্যে কত বিরাট শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, তার থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করা উচিৎ। সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্ট মানুষের মধ্যেও অযুত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে (সুরা তিন্) এবং দৃঢ় ঈমান ও সৎকর্ম জনিত প্রেরনার দ্বারা সে সকল প্রকার বিপদের মোকাবেলা করতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

নৈরাশ্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, সাধারণ লোক আধ্যাত্মিক আন্দোলনকে পার্থিব দৃষ্টিতে পরিমাপ করে, উহার সামর্থ ও শক্তিকে পার্থিব উপকরন ও উপায়ের দ্বারা বিচার করে। তার ফলে যখন তারা দেখতে পায় যে, বিরোধী শক্তিগুলো পার্থিব সম্পদ ও উপকরণে অনেক বেশী শক্তিশালী, তখন তারা নিরাশার শিকারে পরিনত হয়। কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক আন্দোলন তার উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য কখনই পার্থিব সম্পদ এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে না। বরং উহার আসল শক্তির উৎস

আল্লাহতায়ালা স্বয়ং যিনি প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে প্রতিশ্রুত বিজয়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। হযরত আদম (আঃ) কে প্রেরন করে আল্লাহতায়ালা তাঁর সাহায্যে ফেরেস্তাদের নিয়োজিত করেছিলেন; শয়তান এবং তার দল-বল ব্যতিত সকলেই তাঁকে সাহায্যে করেছিল। এ-ভাবে একজন সামান্য মানুষ তাঁর উপর অর্পিত পৃথিবী সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রত্যেক নবীর আগমনকালে এমনিধারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত হতে থাকে এবং তার ফলে আপাতঃদৃষ্টিতে যে আন্দোলনকে দুর্বল ও অসহায় বলে মনে হয়, তা কালক্রমে আকাশচুম্বী সাফল্যের অধিকারী হয় এবং তার সাফাল্যকে তখন অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। একই দৃশ্য সংঘটিত হয়েছে বদর ওহোদ এবং আহযাবের যুদ্ধে, সকল ক্ষেত্রে আসমান হতে ফেরেস্তাগণের অবতরণ হয়েছিল, ফলে কাফেরদের সকল প্রকার উপায় উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্বেও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, খোদার অস্তিত্ব সত্য। সুতরাং তিনি কেমন করে এক-জন সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিকে কঠোর বিরোধীতা পূর্ণ পৃথিবীতে প্রেরন করেন এবং তাঁকে সেই শক্তিগুলো পরাভূত করে সত্যের বাণী প্রচার করতে নিয়োজিত করেন? নিশ্চয়ই সেই সংগে তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত পক্তিকে সেই দুর্বল ব্যক্তির সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করেন। প্রত্যেক মোমেনের এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

নৈরাশ্যের তৃতীয় কারণ এই হতে পারে যে, কোন কোন লোক তাদের আশে-পাশের বিভিন্ন পার্থিব দল বা মতবাদকে লক্ষ্য করে যেগুলোকে সবল এবং সুঠাম বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেগুলোর তুলনায় আধ্যাত্মিক আন্দোলনকে ছোট্র বীজ বা চারাগাছের মত দুর্বল মনে করে। এরূপ ধারনার ফলে তাদের মনে নৈরাশ্যজনিত 'Infreiorty Complex' বা হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সঠিকভাবে বিচার করতে হলে, বীজের সংঙ্গে বীজের এবং আধ্যাত্মিক অন্দো-লনের সংঙ্গে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের তুলনা করা উচিত। পার্থিব আন্দোলন, দল বা পার্টির সংঙ্গে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের তুলনা সম্ভব নয়। কারণ পার্থিব আন্দোলন আগাছার মত যেমন দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠে, সেগুলো তেমনি ক্ষণ-স্থায়ীও হয়। হাজার হাজার বছর ধরে কোন পার্থিব মতবাদ, পার্টি বা দল টিকে থাকার জন্য আসে না। তাই সেগুলোর ঢাক-ঢোল যত-বেশী, স্থায়িত্ব কম। আধ্যাত্মিক আন্দোলনের মধ্যে তুলনা করতে হলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগে ইহুদী ধর্মের প্রাথমিক যুগের তুলনা করা প্রয়োজন এবং ইসলামের বর্তমান যুগের তথা আহমদীয়তের সহিত খৃষ্টান ধর্মের প্রাথমিক যুগের তুলনা করা যেতে পারে। এজন্য কুরআন করীমে বলা হয়েছে:

انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট একজন

রসুল প্রেরন করেছি, যিনি তোমাদের নিকট সাক্ষ্য স্বরূপ—যেভাবে ফেরাউনের নিকট আমরা একজন রসুল প্রেরন করেছিলাম" (সুরা মুজাম্মিল : ১ম রুকু)।

সুতরাং কেহ যদি আহমদীয়াতের বর্তমান অবস্থার সংগে খৃষ্টানদের বর্তমান অবস্থার তথা সংখ্যা ও পার্থিব শক্তির তুলনা করে, তবে সে ভুল করবে। কারণ ৭০—৮০ বছরের গাছের সংগে দুই হাজার বছরের মহীরুহের তুলনা করার মত চেষ্টা নিতান্তই বোকামী হবে। আজ খৃষ্টানদের কর্তৃত্বাধীনে ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ রয়েছে এবং এ ছাড়াও পৃথিবীর সর্বত্র তাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক কী অবস্থায় ছিলেন তা তাঁর নিজের বর্ণনাতেও রয়েছে : "Foxes have holes, birds of the air have nests, but the So of man hath not where to lay his head"—শৃগালের বাস করার গর্ত আছে এবং পাখীদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা গোঁজার একটু জায়গা নাই।" (মথি, ৮:২০)। ক্রুসে আহত ও বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়ে যখন তিনি কাতর স্বরে বলছিলেন : "এলী এলী, লেমা-সাবাক্তানী, অর্থাৎ হে আমার খোদা, আমার খোদা, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করেছ ?" (মথি, ২৭:৪৬) তখন তাঁর বার জন শিষ্যের মধ্যে সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল এবং নিজ নিজ জান বাঁচানোর চেষ্টায় ছিল। যে ধর্মের শুরু হয়েছিল এমনি এক অসহায় ও দুর্বল চিত্রের মাধ্যমে, তখন কেউ কি ভেবেছিল যে কালক্রমে খৃষ্টান জাতি সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ? এমনকি প্রথম তিন শত বছর পর্যন্ত খৃষ্টানদের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, তারা পৃথিবীর মানুষের সংগে বাস করতে সাহস না পেয়ে পাহাড়ের খন্দকে ও গুহায় বাস করতো। খৃষ্ট-ধর্মের এই শোচনীয় প্রাথমিক অবস্থার তুলনায় আহমদীয়া আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা অনেক বেশী উজ্জলতর। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় চার লাখ লোক তাঁর বয়েত গ্রহণ করেন—যদিও কঠোর বিপদ-আপদ এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেককে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং আজ প্রায় ৮০ বছর পরও সংখ্যায় ও সামর্থ বহুগুন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অনেক দুঃখ কষ্ট ও অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। এখনও একশত বছর অতিক্রম হয় নাই, তবুও আহ্‌মদীয়া আন্দোলন এক অতুলনীয় উন্নতি করেছে এবং দিনের পর দিন আরও বর্ধিত হারে উন্নতি করে যাচ্ছে, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু দেশে আহমদীয়া মিশন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল হয়েছে, অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, প্রেস ও রেডিও মারফত প্রচার কার্য চলছে। জনৈক খৃষ্টান লেখক তাঁর "Christ or Mohamad" পুস্তকে লিখেছেন : আহমদীয়া আন্দোলন খৃষ্টান চার্চের নিকট নিঃসন্দেহে একটি

চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। ইহা এখন অনিশ্চিত যে, আফ্রিকাকে কে শাসন করবে—ক্রুশ, না হেলাল?" (S.G. Willi,msoa Uuiversity College, Ghana)।

নৈরাশ্যের চতুর্থ সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, অনেকে 'জালালী' এবং 'জামালী' গুন দুটির মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা গভীরভাবে লক্ষ্য করে না। জালালী (শক্তির বিকাশ) ও জামালী (সৌন্দর্য্যের বিকাশ) সংস্কারকদের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এবং তা ভালভাবে বুঝতে না পারলে কোন কোন সময় ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাফল্যের সহিত ইসলামের বর্তমান যুগ তথা আহ্‌মদীয়াতের প্রাথমিক যুগের তুলনা করে অনেকে নিরাশার চিত্র তুলে ধরেন। বস্তুতঃ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জালালী এবং জামালী উভয় গুন নিয়েই আবির্ভূত হওয়ার কথা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁর আবির্ভাব ছিল জালালী রঙে এবং বর্তমান কালে রূপকভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে জামালী রঙে। কুরআন শরীফে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় লাভ সম্বন্ধে সুরা তাওবা (৩৩ আয়াত) এবং সুরা সাওফ (১০ আয়াত) প্রতিশ্রুতি هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون দেওয়া হয়েছে:। সুরা জুমাতে (৪ আয়াতে) মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের যে উল্লেখ রয়েছে তাতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যই নিহিত রয়েছে। সুরা সাফে (৭ আয়াত) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবকে 'আহমদ' নামে ভূষিত করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নাম এবং কাশ্‌ফী অবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে তাঁর বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে (ফানাফির-রসুল) এই সত্যই নিহিত রয়েছে যে, তাঁর আবির্ভাব রূপকভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব, যদিও ব্যক্তি সত্ত্বার দিক দিয়ে তিনি আলাদা সত্ত্বা, তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) গোলাম বা দাস এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তাঁর শিক্ষা গুরু। ইসলামের প্রথম যুগ ছিল ধর্ম প্রবর্তনের যুগ যার জন্য জালালী। গুণের প্রয়োজন ছিল সেজন্যই তৌরাতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী ছিল: তাঁর-ডানহস্ত হতে 'অগ্নিময় বিধান' উৎসারিত হবে।

(From hisright hand went a fiery law for them—Deuteronomy, 32:2)

তাই দেখা যায় যে, জালালী গুনের অধিকারী সংস্কারকগণ নতুন শরীয়তসহ আবির্ভূত হন (যেমন হযরত মূসা-আঃ এবং হযরত মুহাম্মাদ সাঃ) এবং জামালী সংস্কারকগণ পুরাতন শরীয়তকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন (যেমন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ এবং হযরত মসীহ মওউদ আঃ)। শরীয়তবাহী নবীগণ শুধু নবুয়তই লাভ করেন না, তাঁরা পার্থিব শক্তির অধিকারী হন এবং তার ফলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। এধরনের নবীগণ আধ্যাত্মিক শিক্ষকের গুনে গুনান্বিত হন এবং রাষ্ট্রশাসক হিসেবে আইন শৃংখলা রক্ষা করতেও

বদ্ধপরিকর হন। এ কারণে তাঁর প্রয়োজন বোধে অন্যায়ের মোকাবেলার জন্য যুদ্ধ করতেও হন। পক্ষান্তরে জামালী সংস্কারকগণ কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করেন না, তাঁরা পার্থিব শাসন ক্ষমতাও লাভ করেন না, তাঁরা শুধু যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক নিদর্শনের সাহায্যে বিনয়ের সহিত প্রচার-কার্য পরিচালনা করেন। এই নীতিই হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য তাঁদের আন্দোলন কালক্রমে বিশাল মহীরূহে পরিণত হওয়া অবধারিত। যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে) তার চেয়ে বহুগুনে আহমদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলাম পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে উন্নতি লাভ করবে তা সহজেই বোধগম্য। একদিকে যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর তুলনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রাথমিক যুগে অনেক বেশী উন্নতি করেছেন, অন্যদিকে তেমনিভাবে মুসায়ী মসীহ (আঃ) অপেক্ষা মুহাম্মদী মসীহ (আঃ)-এর সাফল্যও অনেক বেশী আকারের হবে। ইহা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মর্যাদা এবং ইসলামের সার্বজনীনতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট ইলহাম হয়েছে: "সমস্ত বরকত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে"। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাফল্যের সংগে আহমদীয়াতের প্রাথমিক যুগের তুলনা করা অযৌক্তিক।

কুরআন করীমে সুরা ফাতেহ শেষ আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দু'বার সাফল্যলাভের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে: "মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল; তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদেরকে রুকু ও সিজদায় প্রনত দেখবে; তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তৌরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছের সহিত যা হতে নির্গত হয় কচি পাতা, অতঃপর উহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়—যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক; এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধির দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। (সুরা ফাত্হ: ৩০ আয়াত)।

এই আয়াতের প্রথমাংশ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সহচরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর অনুগামীদের সহিত তুলনা দেওয়া হয়েছে এবং কিভাবে সেই উন্নতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে বিরোধী ও অবিশ্বাসী শক্তিগুলোর অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করবে তারও অতিসুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত সন্দেহাতীতরূপে ইসলামের উন্নতির রূপরেখা বর্ণনা করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মহা পুরস্কার দাতা।

নৈরাশ্যের সম্ভাব্য চারিটি কারণ সম্বন্ধে যে, আলোচনা করা হলো তারপরও কোন ঐশী প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, চূড়ান্ত সাফল্য বা বিজয়ের পথ অতীতে যেমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা, আজও নয়। তাই সত্য প্রতিষ্ঠার পথে আজ আমাদেরকে নিজ নিজ প্রিয় সম্পদ, শক্তি ও সময় কোরবাণী করতে হবে এবং অনেক বেশী কুরবাণী করতে হবে। সত্যের বিজয় তো হবেই—কিন্তু সেই বিজয়ের পথে নিজ নিজ অবদান কতটুকু সেটাই ভেবে দেখতে হবে সর্বাগ্রে। নিজের অবদান যদি উল্লেখযোগ্য না হয়, তবে বিজয় আসলেও তার সত্যিকার কোন লাভ নেই, বিজয় আসতে দেরী হলেও হা-হুতাশ করা নিরর্থক। পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-একটি ভবিষ্যদ্বানী উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন :

"হে মানব-জাতি! শুনে রাখ যে ইহা তাঁর ভবিষ্যদ্বানী যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই জামাতকেই বিশ্বের সকল দেশে ছড়াবেন এবং যুক্তি, প্রমান ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইহাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। ঐ দিন আগত, বরং সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে ইহাই একমাত্র ধর্ম হবে; ইহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হবে; খোদা এই ধর্মকে এবং এই সিলসিলাকে অসাধারন এবং অলৌকিক বরকত দান করবেন; আর যে কেহ ইহাকে মিটানোর চিন্তা করে তাকে অকৃতকার্য করবেন। এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী হবে যতক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত না আসে।"

(তাজকেরাতুশ্‌ শাহাদাতাইন)।

[হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর ইংরেজী পুস্তিকা The Future of Ahmadiyyat এর ভাবানুবাদ]

কায়েদ সম্মেলন

আগামী ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪ইং রোজ সোমবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ঢাকা দারুত তবলীগে একটি কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ ও মোতামেদ জেলা কায়েদ, বিভাগীয় কায়েদ এবং কেন্দ্রীয় মজলিসের নাজেমগণের যোগদান একান্ত জরুরী।

তোহফাতুন নদওয়া

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসিহ ও মাহদী (আঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

হাফেয সাহেব বলিতেছেন যে. এই সকল কথার প্রমাণ "কাতয়ুল ওতিন" নামক পুস্তিকায় চমৎকার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি পাঁচ শত টাকার পুরস্কার গ্রহণ করিতে চাহেন না। তৎপরিবর্তে তিনি ইহাই চাহেন যে, আমি কারারনামা লিখিয়া দিই যে, আগামী ইং ১৯০২ সালের ৯ই অক্টোবর হইতে অমৃতসর নগরীতে নদবী উলামার যে বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে, যাহাতে সমগ্র ভারতের খ্যাতনামা আলেমগণ যোগদান করিবেন, তাহাতে নির্বাচিত বিচারক-মণ্ডলীর সমক্ষে অর্থাৎ নদবী আলেমগণের নিকট "কাতয়ুল ওতিন" নামক পুস্তিকায় লিখিত প্রমাণগুলি যদি পরিস্কার কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহারা স্বীকার করিয়া লয়েন যে, আমি যতকাল ধরিয়া অহী প্রাপ্ত হইতেছি এবং যেরূপ পরিস্কার ভাবে এবং দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওহী লাভের দাবী রাখি এবং আমি যেরূপ সহস্র সহস্র আল্লাহ্‌র বাণীরূপে কথা লিখিয়াছি এবং জগতে প্রচার করিয়াছি, সেইরূপ ইহারাও (মিথ্যাবাদীকারীগণও) প্রচার করিয়াছে এবং খোদার নাম লইয়া মিথ্যা রচনা করিয়াছে অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই রবং আমার ন্যায় ইহারাও এক এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আমাকে এই মজলিসে তওবা করিতে হইবে। আমি ইহা স্বীকার করি যে নদবী আলেমগণকে আল্লাহ যদি দৃষ্টি দিয়া থাকেন এবং সততা ও সুবিচার ইহাদের থাকে এবং পূর্ণ মন সংযোগ করিয়া বিবেচনা করার সময়ের অভাব না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমার বক্তব্য এবং হাফেজ সাহেবের "কাতয়ুল ওতিন" পুস্তিকা যাচাই করিয়া সত্য রায় দিতে পারিবে। কিন্তু আমি অমৃতসরের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিনা, কেননা এই সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমি না ইহাদিগকে মুত্তাকি (সাধু ব্যক্তি) বলিয়া মনে করি, (অবশ্য ভবিষ্যতে যদি ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধু হয় তো সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ), না কুরআন নিহিত তত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করি, কারণ এই জ্ঞান লাভ কোন ব্যক্তির لا يمسه الا المطهرون আয়াতের উপযুক্ত হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে বিচারক বলিয়া স্বীকার করিব? তবে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট মৌলভী যদি সত্যান্বেষী হইয়া আমার নিকট আগমন করে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাচনিক উপদেশ দান করিতে পারি। নতুবা আল্লার আরব্ধ কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। কোন

বিরুদ্ধবাদী নাই ইহার গতিরোধ করিতে পারে। বিরুদ্ধবাদীগণের নিকট ফতুয়া (নির্দেশ) লওয়ার অর্থ কি? অবশ্য হাফেয সাহেবের এই ইস্তাহার নদবীগণকে তবলীগ (প্রচার) করিবার আমার একটি সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। হাফেয সাহেব যেন স্মরণ রাখেন যে, "কাতয়ুল ওতিন" পুস্তিকায় নবুওতের মিথ্যা দাবী কারিগণ সম্বন্ধে যে আজগুবি গল্পের অবতারনা করা হইয়াছে। সেই গল্পগুলি ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বাসের উপযোগী হইবেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা সাব্যস্ত হয় যে প্রতারকগণ আপন দাবীতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অনুতাপ করে নাই। কিন্তু দাবীতে ঐরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকা কেমন করিয়া প্রমাণিত হইতে পারে যতক্ষণ পর্যান্ত না সমসাময়িক যুগের কোন পুস্তক হইতে ইহা সাব্যস্ত হয় যে ঐ সকল ব্যক্তিগণ আপন প্রতারনা মূলক নবুওতের মিথ্যা দাবী লইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল এবং সেই যুগের মৌলবীগণ তাহাদের জানাযায় যোগদান করে নাই এবং মুসলমানগণের গোরস্থানে তাহাদিগকে সমাধিস্থ ও করা হয় নাই। পুনঃরায় ঐ গল্পগুলি তত ক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না যতক্ষণ না ইহা সাব্যস্ত হয় যে ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতারনামূলক কথাগুলি যাহা তাহারা আল্লার বাণী বলিয়া চালাইয়াছিল আজ কোথায় এবং উহাদের ওহির পুস্তক কাহার নিকট আছে? তাহা হইলে উহা পাঠে বুঝা যাইত যে ইহারা কখনও চূড়ান্ত বিশ্বাসযুক্ত ওহীর দাবী করিয়াছে কিনা এবং এতদ্বারা তাহারা নিজদিগকে জিল্লী (ছায়া স্বরূপ) অথবা পূর্ণনবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে কিনা এবং স্ব স্ব ওহিগুলিকে বরাবর তাহারা অপরাপর নবীগণের ন্যায় আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছে কিনা। তাহা تقول শব্দের অর্থ ইহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইয়া যাইবে। হাফেজ সাহেবের একথা জানা নাই যে تقول আদেশের প্রয়োগ চূড়ান্ত বিশ্বাসের জন্যই হইয়া থাকে। অতএব যেরূপ আমি বার বার বলিয়া আসিয়াছি আমি যে সকল বাণী শুনাইয়া থাকি উহা কি সেইরূপ চূড়ান্ত এবং বিশ্বস্তভাবে আল্লার বাণী যেরূপ কোরআন এবং তৌরিত। আমি জিল্লী (প্রতিবিম্ব স্বরূপ) এবং বরুজী (সমগুন বিশিষ্ট) ভাবে আল্লার নবী। ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমার অনুশাসন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং মসিহ মওউদ বলিয়া আমাকে বিশ্বাস করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। যাহার নিকট আমার সংবাদ পৌঁছিয়াছে হউকনা কেন সে মুসলমান তথাপি যদি সে আমাকে স্বীয় হাকাম (বিচারক) বলিয়া গ্রহণ না করে, এবং আমায় মসিহ মওউদ বলিয়া না মানে এবং আমার ওহী গুলিকে আল্লার তরফ হইতে বলিয়া বিবেচনা না করে, সে আল্লার দরবারে দণ্ডনীয় হইবে কেননা আপন কালের যে অনুশাসনকে ইহার সাদরে বরণ করা উচিৎ ছিল তাহা সে প্রত্যাখান করিয়াছে। আমি কেবল ইহাই বলিতেছি

না যে আমি মিথ্যাবাদী হইলে বিনষ্ট হইয়া যাইতাম ; পরন্তু আমি ইহাও বলিতেছি যে, আমি মুসা, ইসা, দাউদ এবং হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর ন্যায় সত্যবাদী এবং আমার সত্যতা সপ্রমানিত করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্তায়ালা দশ সহস্রের অধিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। কুরআন আমার সত্যতার সক্ষ্য দিয়াছে হযরত মোহাম্মাদ (দঃ) আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহার পূর্ববর্ত্তী নবীগণ আমার আগমনের যুগ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন যাহা এই বর্ত্তমান যুগ এবং কুরআন ও আমার আগমনের যুগ নির্দেশ করিতেছে যাহা এই যুগ এবং আমার জন্য আকাশ ও পৃথিবী সাক্ষ্য দিয়াছে এবং এমন কোন নবী গত হয় নাই যিনি আমার আগমনের শুভ সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ।

জুমার খুৎবার অবশিষ্টাংশ

(১৫-পৃষ্ঠার পর)

উপর এই কর্ত্তব্য বর্ত্তায় যে, আমরা আমাদের স্থানগত দূরত্বকে পারস্পরিক দূরত্বে রূপান্তরিত হইতে না দেই বরং সমগ্র জগতের আহ্মদী-গণকে (যতজনই এ পর্যন্ত মানব জাতির মধ্য হইতে আহ্মদী হইতে পারিয়াছে, তাঁহাদিগকে) একে অন্যের নিকটতর আনয়নের চেষ্টা করি। সুতরাং সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরে আমার অন্তরে অত্যন্ত তীব্রভাবে এই অনুভূতির উদ্রেক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি কথা ত এইরূপ, যাহা সালানা জলসার পূর্বে বলা হয়ত সমীচীন নহে, কিন্তু দুইটি কথা এমন আছে যাহা আমি উক্ত ভূমিকা সহকারে বিস্তারিত ভাবে বলিতে চাই।

প্রথম কথাটি এই যে, আমাদের সালানা জলসা এবং মোশাওরাত এইরূপ উপলক্ষ যে, উহাদের মধ্যে জগত হইতে আহ্মদীগণের (সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ভিতর দিয়া) যোগদান জরুরী হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ আমি সালানা জলসাকেই লইব। মজলিসে মেশাওয়ারতে (শুরায়) বিশ্ব-জোড়া আহ্মদী প্রতিনিধিগণের যোগদান সম্বন্ধে কতক ব্যপার এখনও বিবেচনাযোগ্য রহিয়াছে। উহাদের সম্বন্ধে বিবেচনার পর, ইনশায়াল্লাহ্ আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া তৌফিক এবং হেদায়েতের আলোকে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিব। এখন পর্যন্ত যে কথা মনের মধ্যে আসিয়াছে উহা এই যে, সালানা জলসা সম্পর্কীয় কাজ আরম্ভ করা উচিত। (অসমাপ্ত)

(সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান), ৩রা সুলেহ্/জানুয়ারী, ১৩৫৩ হিঃ শাঃ/১৯৭৪ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণের নামে
হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর জরুরী পয়গাম
জামাতের মোখলেসীন শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী (জশন) ফণ্ডে যথাসাধ্য বেশী বেশী অংশগ্রহণ করুন।

বেরাদেরানে কেরাম,

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

আমি সালানা জলসায় বহির্দেশে জামায়াত সমূহের তরবিয়ত ও ইসলাম প্রচারের কাজকে দ্রুত হইতে দ্রুততর করার ও ইসলামের বিজয়ের দিন নিকট হইতে নিকটতর করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সুত্রপাতের উদ্দেশ্যে একটি অতি মহা পরিকল্পনার এলান করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি জামায়াতের মোখলেস্ গণের নিকট আগামী ষোল বৎসরের মধ্যে এই মহান পরিকল্পনাকে সম্পন্ন করার জন্য আড়াই কোটি টাকা জমা করার অহ্বান জানাইছি এবং তৎসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করিয়া এই এলানও করিয়াছি যে, ইনশাআল্লাহ্ টাকার পরিমাণ পাঁচ কোটি পর্যন্ত পৌঁছিবে। অত্র পয়গামের দ্বারা মোখলেসীনে জামাতকে তাহরীক করিতেছি যে তাহারা যেন এই ফণ্ডে যথাসাধ্য বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনটি কথা মনে রাখিবেন :—

(ক) শত বার্ষিকী জুবিলী ফণ্ডের ওয়াদার তালিকা আমাকে মজলিস মেশাওয়ারতের (অর্থাৎ ২৯শে মার্চের) পূর্বে পাঠাইয়া দিবেন। *

(খ) ওয়াদা সমূহ শুধু বর্তমান আয়ের দিকে লক্ষ রাখিয়া যেন না হয় বরং আল্লাহ্তায়ালার উপর তওক্কুল করিয়া ও তাঁহারই উপর ভরসা করিয়া আগত ষোল বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপরে যে অশেষ করুনা ও আশীষ নাজিল করিবেন এবং আপনার আয়-উপার্জনের মধ্যে আপনাকে আশাতীত বরকত দিবেন সেগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া ওয়াদা সমূহ প্রেরন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত নগদ টাকা বা চেকের সহিত ইহা উল্লেখ করিতে হইবে যে, এই চাঁদা শতবার্ষিকী জুবিলী ফণ্ডের খাতে দেওয়া হইল এবং ইহা মহা-সেব, সদর আঞ্জমনে আহ্মদীয়ার নামে পাঠাইতে হইবে। *

আল্লাহ্তায়ালা আপনার এখলাসে বরকত দিন এবং আগামীতে আপনাকে উন্নতমানের কোরবানী করার তৌফিক দান করুন এবং ঐ কোরবানীগুলি নিজ অনুগ্রহে কবুল করুন। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসিহ সালেস

[সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান) ১০ই সুলাহ/জানুয়ারী ১৩৫৩/১৯৭৪।]

---

* বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশের জামাত সমূহের তরফ হইতে দশ লক্ষ টাকার ওয়াদা ইতিমধ্যে হুজুরে আকদাস (আইঃ) এর খেদমতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি সত্তর নিজ নিজ ওয়াদা এবং নগদ টাকা বা চেক কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্মদীয়া ঢাকায় সত্তর পাঠাইয়া আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ-ভাজন হউন। (নিবেদক—আমীর, বাঃ আঃ আঃ)

শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী (জশন) পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস(আইঃ)-এর

নূতন গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক

১। প্রত্যেক ইংরেজী বা হিজরী শামসী মাসের শেষ সপ্তাহে যে কোন এক নির্দ্ধারিত দিনে (সোমবার বা বৃহস্পতিবার) রোজা রাখিবেন।

২। এশার নামাযের পর হইতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত অথবা যোহরের নামাযের পর দুই রেকাত নফল নামায পড়িবেন।

৩। দৈনিক ৭ বার সুরা ফাতেহা পড়িবেন এবং ইহার মধ্যস্থিত তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন।

৪। "সুবহানাল্লাহে ও বেহামদিহী সুবহানাল্লাহেল আজীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালে মোহাম্মাদ"—এই দোয়া দৈনিক ৩৩ বার পড়িবেন এবং "আস্তাগফেরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লে যামবেঁও ওআতুবো এলাইহে" ৩৩ বার পড়িবেন।

৫। "রাব্বানা আফরেগ আলায়না সাবরাঁও ও সাব্বেত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমেল কাফেরীন"—দোয়া ১১ বার পড়িবেন। অনুরূপ ভাবে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলোকা ফি নুহুরিহীম ও নউজুবেকা মিন শুরুরিহীম"—দোয়াও ১১ বার পড়িবেন।

ইহা ব্যতিরেকে নিজের ভাষায় বহুল পরিমানে দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের নগণ্য কুরবানীকে কবুল করেন এবং আমরা ইসলামের বিজয়ের রাজপথে আগে বাড়িতে চলিয়া যাই এবং জগতকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঝাণ্ডার নীচে জমা করিবার কাজে সফলতা লাভ করি।

এখন হইতে উপর্যপরি উনিশ শ' আশি সন অর্থাৎ শত বার্ষিকী জশন পর্যন্ত উক্ত পদ্ধতিতে রোজা ও নফল নামাজ আদায় এবং দোয়া সমূহের পাঠ বিনা ব্যতিক্রমে জারী রাখিতে হইবে।

[সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান), ১৪ই মার্চ, ১৯৭৪ইং]

(২৮-এর পৃঃ পর)

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতরম জনাব আমীর সাহেব। এই ইজতেমার কাজ সকল দিক হইতে সফলতা লাভ করে।

চট্টগ্রাম মজলিসের ইজতেমার উদ্বোধন করেন জনাব নায়েব সদর মজলিসে মূলক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, এই ইজতেমাও খোদার ফজলে সকল দিক হইতে সফলতা লাভ করিয়াছে।

শান্তি

শান্তি, শান্তি, শান্তি ঘোষণায় পূর্ণ ভূ-মণ্ডল
সৃষ্টি তবুও অশান্তির দোলায় করিতেছে টলমল!
শান্তি-বিতরণ-বিমানে উড়ন্ত-শান্তির দেবতাগণ
শান্তির-পেয়ালা আন করে, করে শীর্ষ-সম্মিলন!

শান্তি কি সেথায় খাদ্যের দেশে উদর-পূর্তি খাওয়া
কারখানাতেই খাদ্য-বণ্টন জঠর পরিমাণ পাওয়া!
আহারেই মানুষ তুষ্ট থাকিবে তবু কেন জাগে দুখ
স্বপ্নে কি রাজে সুখের সংসার সবার এই উৎসুক!

শান্তির দেশ স্বর্ণ-মুদ্রার-ডলার পাউণ্ডে ভরা
সুখের বিধান হুকুম মাত্র স্বহস্তে ভাগ্য গড়া!
সহসা যেদিন 'বর' আসিল, বাতিতে ফুরিয়ে তেল
সুখ-সম্ভাষণ কে জানাবে, রজনী পোহায়ে গেল!

ইয়াজুজ মাজুজ পরামর্শে মিলি বাঁধিবে শান্তির পুল
হুসিয়ার করে উভয় উভয়ে দেখো যেন না হয় ভুল!
শান্তি-সম্রাট 'জুলকারনাইন' * করে দিলেন সাবধান
শান্তি বিধান লঙ্ঘনে কিন্তু হয়ে যাবে খান খান।

'ইসলাম' বলে শান্তি আমিই আমার অন্তর দেহ
আমার সীমানার বাহিরে জগতে পাবেনা শান্তি কেহ!
শান্তির দ্যুত প্রেরিত আল্লাহর 'নবুয়ত' রশ্মি প্রাণে
মানব মরুতে আনিবে শান্তি প্রাচুর্য্য সম্ভার দানে।

—চৌধুরী আবদুল মাতন

---

* হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এলাহামী উপাধী এবং কুরআন বর্ণিত তাঁহার একটি গুণবাচক নাম।

মসীহ মওউদ দিবস উদযাপন

(১)

মসিহ মওউদ দিবস উপলক্ষে সভা

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ২৪শে মার্চ রবিবার বিকালে দারুত তবলীগ মসজিদে মোহ্‌তারম জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওতের পর মুহতারম মকবুল আহ্‌মদ খান, আমীর ঢাকা আঞ্জুমান এবং মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সনে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) কর্তৃক বয়েত গ্রহণের সূচনার মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তার সাধনের মহান উদ্দেশ্যে জামাত আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠা, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার যুক্তি, প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী এবং হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) কর্তৃক দীনে-ইসলামের পূণ-র্জীবন ও একামতে শরিয়ত সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তৃতা করেন। মোহ্‌তরাম আমীর সাহেব সর্বশেষে উক্ত বিষয়াবলীর উপর জ্ঞান পূর্ণ আলোক পাত করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বাবরকত জলসার কাজ সমাপ্ত হয়।

(২)

চট্টগ্রাম আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার উদ্যেগে ২৩শে মার্চ রোজ শনিবার স্থানীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদে জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান, প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন-তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর জনাব মৌঃ আজিজুর রহমান, জনাব শামসুল আলম, জনাব এ, বি, এম, আব্দুস সাত্তার, জনাব মোসলেহ্‌ উদ্দীন খাদেম এবং মৌঃ মুহিবুল্লাহ্‌, সদর মুরুব্বী এই পবিত্র ও মহান দিবসের তাৎপর্য এবং হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকে আলোক-পাত করেন। অতঃপর সভাপতির ভাষন ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

(৩)

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ময়মনসিংহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মসীহে মওউদ দিবস উদযাপন করিয়াছে। বিগত ২৪শে মার্চ রবিবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তেলাওয়াতে কুরআন ও নজম পাঠের পর সমীহে মওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। মসীহে মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত এক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও পাঠ করা হয়। সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই মার্চ রোজ রবিবার নারায়নগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং চট্টগ্রাম

(২৬ এর পৃঃ দেখুন)

'আসিয়াছে আল মসীহা'

—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি এলেন। এসে ঐশী ঘোষণা শোনালেন: ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) ওফাত পেয়েছেন। ক্রুসে নয়। স্বাভাবিক ভাবে, পরিণত বয়সে। কোটি কোটি খৃষ্টান আর কোটি কোটি মুসলমান বিস্ময় আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর দিকে। মক্কর আর চক্রান্তে তৎপর হয়ে উঠলো অগণিত আদম সন্তান তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন করলো, সেই চিরাচরিত অভিযোগ—'এই ব্যক্তি তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে!'—কিন্তু সেই চিরাচরিত ভাবেই বিজয় তারই হলো—বাহু শক্তির নয় যুক্তির বিজয়, সম্পদের নয় দলীলের বিজয়, জনশক্তির নয় ঈমানের প্রকাশ্য বিজয়—ফতহে মুবীন। ক্রুশ ভেঙ্গে গেল। খোদার পুত্রত্বের জঘন্য ফেৎনা সমাধিস্থ হলো। আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উপদ্রব স্তিমিত হলো। ভাঙ্গা ক্রুশ গলায় বেঁধে পাদ্রী পুরোহিতরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো।

তিনি এলেন। খোদা, চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব খোদা তাঁকে পাঠালেন। নেতি ও নৈরাশ্যের কোহকাফ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবাত্মার সামনে আপনার অস্তিত্বের উজ্জ্বল সূর্য প্রমাণ মসীহাকে পাঠালেন! নাস্তিকতা আর নৈরাশ্যের পাহাড় ধূনিত তূলার ন্যায় উড়ে গেল। অস্তি-সূর্যের তজল্লীতে ঝলমল করে উঠলো সত্যান্বেষীর মননের প্রান্তর—হৃদয়ের আসমান।

আল-মসীহা এলেন। ঘোষণা করলেন—দার্শনিকের খোদা থাকতে ও পারে, নাও পারে; কিন্তু আমার খোদা আছেন। অন্য সকলের খোদা একাদিক হতে পারে অবাক অসহায় হতে পারে; কিন্তু আমার খোদা এক সবাক ও সর্বশক্তিমান। তিনি সকলের নির্ভর ও আশ্রয়স্থল। তাঁর মত কেহ নাই। তিনি আমার অগণিত প্রার্থনা কবুল কয়েছেন,—আমার সঙ্গে এন্তার বাক্যালাপ করেছেন। আমার খোদা সকলের প্রার্থনা শুনেন, সকলের সঙ্গে কথা বলেন, অবশ্য যারা তাঁর প্রেমাকাংখী, কৃপাপ্রার্থী।

আমি সকল মানুষের জন্য কথা বলি, ক্রন্দন করি, প্রার্থনা করি। আমি প্রার্থনা করি। আমি প্রেরিত পুরুষ—আমি নবী। আমার নবুওয়ত মোহাম্মদীয় নবুওয়ত—আমার রেসালত মোহাম্মদীয় রেসালৎ। আমি আমার প্রভু, আমার নেতা মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণান্বিত প্রতিবিম্ব। আমি তার কামেল গ্রন্থ কোরআন করিমের পূর্ণ শিক্ষা দিতে এসেছি। তাঁর কামেল শরীয়তের পূর্ণ প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তাঁর শরীয়তের পূর্ণ এত্তেবা

করে তাঁর সিরাতুল মুস্তাকিমে চলে আমি সকল প্রকার নেয়ামত লাভ করেছি,—আমি সালেহ হয়েছি—শহীদ হয়েছি—ছিদ্দীক হয়েছি—নবী হয়েছি। আমি আমি অতীতের সকল নবীদের প্রতিবিম্ব। কেননা আমার প্রভু (সাঃ) সকল নবীর আধার। সকল নবুওয়তের নদী আমার প্রভু (সাঃ)-এর মহাসাগরেই পতিত হয়েছে। আমি আমার প্রিয় প্রভুর পূর্ণ প্রতিবিম্ব। আমি রহমতুল্লিল আলামিনের রহমতের পূর্ণ বিকাশ খাতামানন্নাবিয়ীনের খাতামের পূর্ণছাপ আমি তাঁব সৌন্দর্যাকারে দ্বিতীয় প্রকাশ। তিনি সত্তা আমি বিম্ব। তিনি আছেন—আমি আছি। এবারে তাকে দেখতে হলে আমাকে দেখতে হবে। ইহাই সুরা জু'মার 'ওয়া আখরিনা মেনহুম' আয়াতের বক্তব্য। যারা 'লা নবীয়া বাদী'র—অর্থ করলো 'আমার পরে নবী আসবে না'—তারা এই মহাভুল করলো যে, তারা নবুয়তের ধারাকে নিম্নগামী বিবর্তনের ধারা মনে করলো; এবং ধরে নিলো যে, সেই ধারা মোহাম্মাদ (সাঃ)-এ নেমে এসে খতম হয়ে গেছে। আর কোনো নবী আসবেন না। এই ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তারা বেমালুম ভুলে যায় যে, ঈসা (আঃ) আসবেন। আসলে তাদের এই বিবর্তনের ধারনা স্বয়ং বিবর্তন-বিরাধী। কেননা, বিবর্তন সদাই পূর্ণমুখী—উর্ধমুখী। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তো ইহার নিম্নগামীতার প্রশ্নই উঠে না! সেক্ষেত্রে বিবর্তন সর্বতোভাবে উর্ধগামী। এবং রূহানীয়তের উর্ধগামীতা ক্রমোন্নতির ধারায় উঠতে উঠতে 'মকামে মাহমুদে' পৌঁছে পূর্ণ হয়ে গেছে খতম হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, উহাই সৃষ্টিরও শীর্ষ বিন্দু—উহার পরে আর সৃষ্টি নাই। উহাই সকল প্রকার নেয়ামতের,—কল্যাণের শীর্ষ বিন্দু; উহাই মানবতার, মনুষ্যত্বের নবুয়তের শীর্ষবিন্দু; ঐ যে বিন্দু যার বাদে আর কোনো সৃষ্টি নাই—যাকে অতিক্রম করে যার উপরে আর মানুষ নাই নবী নাই কোনো ফেরেশতা নাই—কোনো সৃষ্টি নাই—উহারই অপর নাম মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

সকল মনুষ্যত্ব এবং মানবতা, সকল শুভ এবং কল্যাণ, সকল নেয়ামত এবং বারাকাত সকল নবুয়ত এবং রেসালৎ আমাদের প্রিয়-নেতা ও প্রিয়প্রভু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্তায় পৌঁছে গিয়াই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে কামালিয়ত অর্জন করেছে। ঐ পূণ্য পবিত্র সত্তাই 'খুলুকিন আযীম'—যদি উহা অস্তিত্ববাস না থাকতো তা হলে মনুষ্যত্ব বিকশিত হতো না, মানবতা উন্নীত হতো না, আশীষ ও কল্যাণ কামালিয়াত অর্জন করতো না, রেসালাত ও নবুয়তের নূরের প্রদীপ জ্বলতো না—সৃষ্টি আলোকিত হতো না। ঐ আলোই সৃষ্টির আদি। উহার প্রদীপ অনির্বান, ঐ সিরাজুম মুনীরার আলোর ভাস্বরতা অফুরন্ত। দূর অতীতের সকল প্রদীপ ঐ প্রদীপের অনন্ত তজল্লী থেকেই আলো আহরণ করেছে--অনাগত ভবিষ্যের সকল প্রদীপ ও আহরণ করতে থাকবে। ঐ আলোকের

পরশ ভিন্ন আভা নাই। ঐ আলোকের প্রতিফলন নাই। অতীতে উহার প্রতিফলন আংশিক ভাবে ঘটেছে, এবারে উহার পূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে। দরুদ শরীফের নিত্য প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

খোদাতায়ালার অপার অনুগ্রহে যে, অনুরাগের অস্তিত্ব ঐ সীরাজুম মুনীরার পূর্ণ প্রতিফলন আপনার মধ্যে প্রতিভাত করার মহাসৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে—যে সমর্পিত সত্তা ঐ খুলুকিন আযীম—ওস্‌ওয়াতুন হাসানার সৌন্দর্য রাশির বিকাশ আপনার মধ্যে উদ্ভাসিত করে তোলার তৌফিক লাভে সমর্থ হয়েছে—সেই মহিমান্বিত অস্তিত্ব সেই সম্মানিত সত্তাই তো রহমাতুল্লিল আলামীনের রহমতের রাজসংস্করণ! উহাই তো খাতামান্নাবিয়ীনের খাতামের স্বর্ণালী মুদ্রন: উহারই নাম তো গোলাম আহমদ (আঃ)। কী মহিয়ান তাঁর সাধনা! কত মকবুল তাঁর আরাধনা! কী অনন্য তাঁর ভালবাসা! তিনি ধন্য! তিনি ধন্য!! তিনিই তো মোহরে নবুয়তের বির্মূত প্রতীক। তিনিই তো খাতামান্নাবিয়ীনের অনন্য দৃষ্টান্ত—দ্বিতিয় প্রকাশ। শ সর্বকল্যাণময়—সর্ব আশীষমণ্ডিত মোহরের আলো অনন্ত অফুরন্ত,—ঐ খাতামের তজল্লী সদা প্রকাশমান যিনি উহার কিঞ্চিৎ মাত্র প্রতিফলন লাভেও সমর্থ হয়েছেন বা হবেন তিনি মহীয়ান। তিনি সম্মানিত। তিনি ধন্য! হায়! যারা এহেন খাতামন্নাবিয়ীনের ব্যাখ্যা 'শেষ হইয়া গিয়াছে' করে তাদের জন্য আফসোস শত আফসুস! হায়! তারা তারা অজ্ঞানবশত: কী মহাবঞ্চনার অন্ধকারেই না নিজে দেরকে নিক্ষেপ করেছে! খাদা আমার! রব্বে রহীম, তোমার রহমতুল্লিল আলামীনের কিছু রহমত তাদেরকে দান করো। তারা ভুলে যায় যে,—'মা কানা মুহামাদ্দিন' আয়াতে করীমাটির প্রসঙ্গ পিতৃত্ব। সুতরাং এই আয়াতের 'রসুল্লাহ' এবং 'খাতামান্নাবিয়ীন' শব্দ দুইটির প্রথম ও প্রধান অর্থ হচ্ছে আল্লার রসুল হিসেবে তিনি যেমন সকল মানুষের আধ্যাত্মিক পিতা তেমনি সকল নবীগণেরও তিনি আধ্যাত্মিক পিতা। সকল বনী আদম—সকল নবীও রসুলের পিতৃত্বের শানে সংযোজিত উল্লিখিত শব্দদু'টি বাদ দিকে দিলে কিংবা তাদের ভিন্ন অর্থ করলে—রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অপুত্রক বা 'আবতার' বলে (নাউজুবিল্লাহ্) চিত্রিত করা হয়। কিন্তু তিনি তা নন—সুরা 'আল কাওসার' জলদ গম্ভীর স্বরে তার সাক্ষ্য দান করেছে। মানুষের ইতিহাস তার স্বর্ণোজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। তেমনিভাবে—কুল আনা বাশারুল মিছ্‌লুকুম ইউহা ইলাইয়া' (ঘোষনা করো যে, আমি তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আমার উপরে ওহী হয়) আয়াত শরীফটির 'ইউহা ইলাইয়া'—মহিমাকেই অংশ বাদ দিয়া আমরা যারা ভুল ব্যাখ্যা করে তারা অজ্ঞতাবশতঃ রসুল (সাঃ)-এর 'আদর্শত্বের' মহিমাকেই পরিহার করে। খোদার পুত্রত্বের মিথ্যা আকিদা খণ্ডন করাই এই আয়াতের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যে। যে মোহাম্মাদ (সাঃ)-

এর সত্তাকে অপবিত্রতা কখনই স্পর্শ করতে পারে নি, যাঁকে আল্লাপাক স্বয়ং 'রৌফ' ও 'রহীম' আখ্যা দান করেছেন,—আমাদের মত লোকদেরকে 'বান্দা' বলে সম্ভাষন করার হুকুম দিয়েছেন—তাঁকে 'আমাদের মতই মানুষ' বলে আমরা যারা কীর্তন করি—এদের দুনিয়া-কাতর চিত্তের সাধ্যই নেই যে মোহাম্মদীয় মহিমার শান বুঝি। যিনি বুঝেন—যিনি সেই মহা মহিমার শ্রেষ্টতম অনুধ্যানী এবং তাঁর পূর্ণ গুণান্বিত প্রতিবিম্ব সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী মাহুদ (আঃ)-এর দু'একটি কালাম এ প্রসঙ্গে পেশ করছি :—

(১)

আমি খোদাতায়ালার ভয়ের জন্য তাঁকে (সাঃ) খোদা তো বলতে পারি না; কিন্তু খোদার কসম তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্য খোদা নোমা।

—(কিতাবুল বারিয়া)

(২)

আহমদ احمد (সাঃ)-এর শান খোদাওন্দ-তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি তাঁর খুদী থেকে এমনভাবে লয় হয়ে গেছেন যে, মীম মাঝ খান থেকে খসে পড়েছে। তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের মধ্যে এমনভাবে লয় হয়ে গেছেন যে, প্রগাঢ় মিলনের ফলে তাঁর সত্তা সরাসরি রব্বে রহীমের সুরত বনে গেছে। (তৌজিয়ে মারাম)

(৩)

وان سئلت ما خلقه العظيم فنقول

انه رحمن رحيم -

যদি এই প্রশ্ন করো যে তাঁহার 'খুলুকে আযীম' (মহান চারিত্রিক গুণাবলী) কি তবে তার জবাবে আমি বলবো যে, তিনি (সাঃ) রহমান এবং রহীম। —(এ'জাযে মসীহ)

(৪)

আঁ-হযরত (সাঃ) উলুহিয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, এবং তাঁর কালাম খোদার কালাম, তাঁর প্রকাশ খোদার প্রকাশ, তাঁর আগমন খোদার আগমন।

—(সুরমা চশমা আরিয়া)

(৫)

নিশ্চয়ই আমি তোমার জ্যোতির্ময় এবং আলো-বিকীরনকারী চেহারায় এমন এক মহিমা দেখিছি যাহা মানবীয় সকল বৈশিষ্ট এবং গুনাবলীকে অতিক্রম করে গেছে।

(আইনায়ে কামালাতে ইসামে)

(৬)

তিনি আপন পূর্ণতায় আপন সৌন্দর্যে এবং আপন মহিমায় আপনার প্রেম-বিগলিত হৃদয় সহ সৃজনমণ্ডলীকে অতিক্রম করে গেছেন।

(কেরামাতাস সাদেকীন)

(৭)

হে খোদাতায়ালার রহমত! আমি রহমতের প্রার্থী ও মুখাপেক্ষী হয়ে এসেছি এবং আপনার দুয়ারের সামনে আমারই মত লাখো প্রার্থী ভীড় করে আছে। (আয়নানে কামালাতে ইসলাম)

আমরাও আজ সেই রহমান ও রহমতুল্লিল আলামীনের প্রতিশ্রুত উত্তরাধীকারীর মহিমান্বিত দরবারে সেই যে রহমতেরই ভিক্ষা প্রার্থী, তাঁরই

করুনার মুখাপেক্ষী। আমাদের হৃদয়েরও আকুল প্রর্থনা—হে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শান ও সৌন্দর্যের অখণ্ড ও অনাবিল জ্যোতির্বিকাশ! তোমার সেই মহাজ্যোতির কিঞ্চিৎ আভায় আমাদেরও সত্তা ও অস্তিত্বকে উদ্ভাসিত করে তোলো। হে সেই সে রৌফ ও রহীম, সেই খোদা-নোমার খোদায়ী হৃদয়ের আনন্দোজ্জ্বল প্রসূন, তোমার মধুময় সুরভিতে বিভোল করো আমাদেরও মনপ্রাণ—

আমরা দেখিছি বনী আদমের আঁধিয়ার আসমান,
তোমার সুবহ এন্তেজারিতে কেঁদে কেঁদে পেরেশান
আমরা দেখিছি যুগ-যামানার আঁধার এ ময়দান,
তোমার পূর্ণ চাঁদের কিরনে বিমল দৃশ্যমান।
দেখেছি কাবার পথিকের চোখে আঁধার
গিয়েছে টুটে,
দেখেছি সে চোখে দূর-মকসাদ মঞ্জিল ফুটে ওঠে।
কাবায়ী দীলের কাফেলা চলিছে তৌহিদের
ওই জলসাতে,
খোদার যিক্‌র মুহাম্মাদের নাতিয়া
গাহিছে একসাথে।
দৃপ্ত তাদের কদম, দৃষ্টি আকাবা-শপথে ভরা,
নকীব! তোমার ডাক সে শুনেছে
ঐশী-নিশান ঝরা।
মুমীন দীলের কপোত-কাবার, অজু সেরে
জমজমেতে ঐ
উড়ে পত্‌পত্‌ উড়িছে শূন্যে দূর বায়তুল
মামুরে ঐ।
আঁখিতে তাহার স্বপ্ন সুদূর—
সিদ্‌রা'—মুন্তাহার
হৃদয়ে ইশ্‌কে-ইলাহী, কণ্ঠে সালাম মুস্তাফার।
সারবাঁ! তোমার ইকাল উড়িছে ইয়া লামলাম
গিরির চূড়ে
সারবাঁ! তোমার কাফেলার গান কেঁপে কেঁপে
উঠে ফারান তুরে।
কাবার গিলাফে তৈরী তোমার মিনারা খচিত
পতাকা ঐ,
উড়ে বদরের মেঘের আড়ালে উড়িছে সাফার
শিখরে ওই;
ওই শোনা যায় মীনা মদীনার
আরাফার আসমান
আলোড়িয়া ওঠে স্বাগতম ধ্বনি:
আহলান-সাহলান।
স্বাগত মসীহা! জা'য়াল মসীহ্‌:
শান্তির দূত আস্‌সালাম।
খোদার আরশ: মখলুক-মনি
আস্‌সালাম ওয়াস্‌সালাম
মুহাম্মাদের নূরের বিম্ব:
মাহ্‌দী মওউদ আস্‌সালাম
কূল মানুষের মুক্তির দূত:
হে আহমদ আস্‌সালাম
ইমামে জামান আস্‌সালাম
আল মসীহা আস্‌সালাম
আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম !!!

—(:)(:) (:)(:) (:)(:)—

ফামা আ'যামা শানো কামালিহি
আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহে ওয়া আলেহি॥

—কালামে মসিহ মওউদ (আঃ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সকল আহ্‌মদী ভগ্নির অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, হযরত খলিফ'তুল মসিহ্ সালেস্ (আইঃ) এর মঞ্জুরী ক্রমে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার শ্রদ্ধেয় জনাব আমীর সাহেব মোহ্‌তারামা মিসেস মাস্থদা সামাদকে বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লার সদর (President) নিযুক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার মজলিসে আমেলার কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী উল্লেখ করা হইল।

নাম	পদবী
সভানেত্রী	মিসেস মাস্থদা সামাদ
সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত	মিসেস সাদেকা হক
,, খেদমতে খালক	মিসেস হাসিনা বেগম
,, নাসরাতে আহ্‌মদীয়া	মিসেস নাসীরা সাদেক
,, তবলীগ	মিসেস মাহ্‌মুদা মহিউদ্দিন
,, ওয়াকফে জদিদ ও তালীমে কোরআন	মিসেস ওবায়দুর রহমান

আশা করি বাংলাদেশের সকল লাজনা এমাউল্লার সংগঠন এখন হইতে কর্মে তৎপর হইবেন এবং যেখানে যেখানে লাজনা কায়েম হয় নাই সেখানে সেখানে লাজনা কায়েম করিয়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন— যেমন, চাঁদা পাঠানো, মাসিক কার্য বিবরনী রিপোর্ট দেওয়া ইত্যাদি।

আরো জানানো যাইতেছে যে প্রত্যেক জামাতে লাজনার অধীনে নাসারাতের (৭-১৫ বৎসর বয়সের মেয়েদের নিয়ে গঠিত) সংগঠন বনাম "নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া" কায়েম করিবেন এবং লাজনা এমাউল্লার মাধ্যমে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় (যেখানে সম্ভব) হালকা কায়েম করিয়া নিয়মিতভাবে হালকা সভার ব্যবস্থা করিবেন।

প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্

———

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দিক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশিবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.